সেপ্টেম্বর ২০২৫

আখবারে তওহীদ

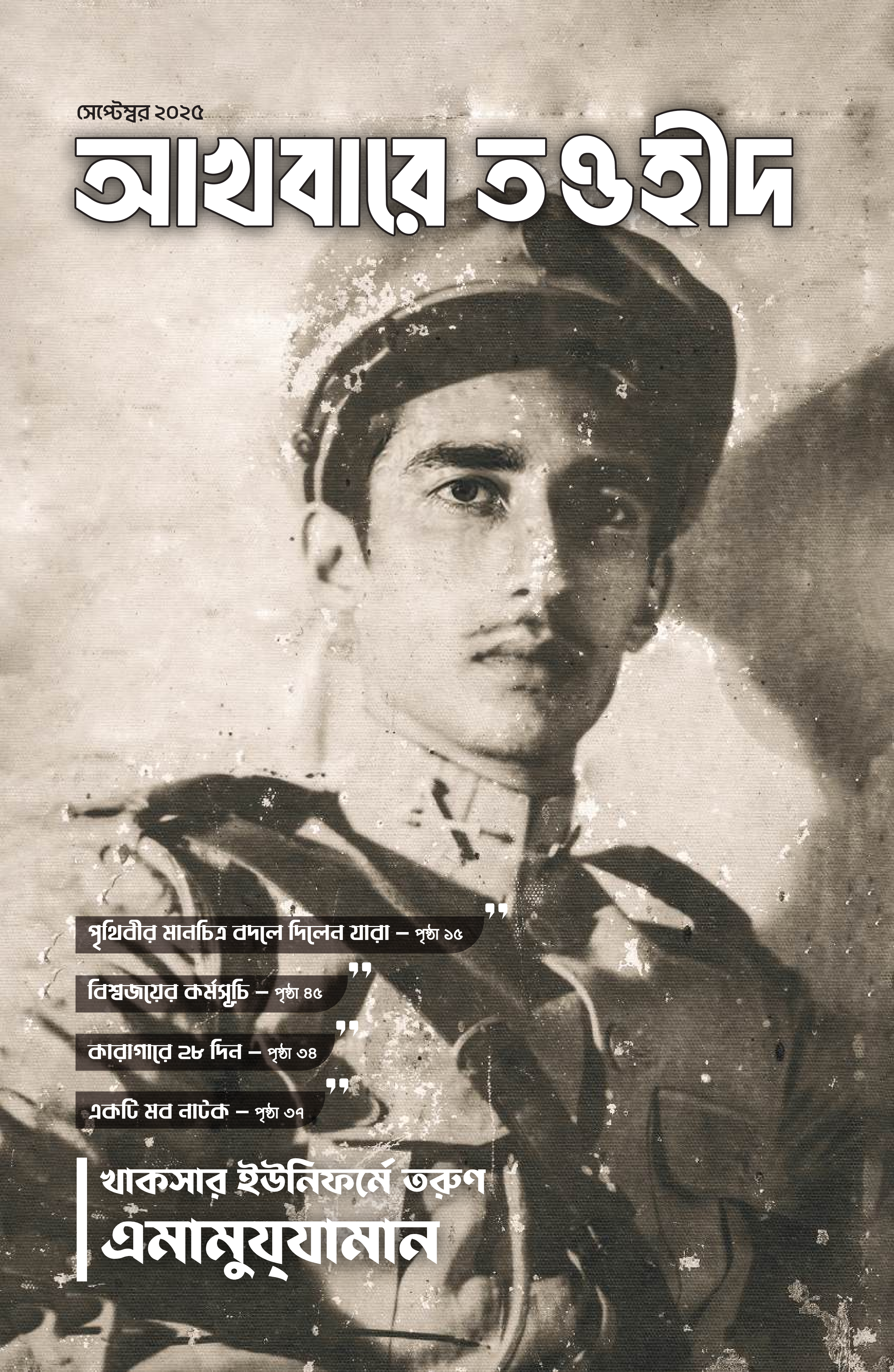

পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিলেন যারা – পৃষ্ঠা ১৫

বিশ্বজয়ের কর্মসূচি – পৃষ্ঠা ৪৫

কারাগারে ২৮ দিন – পৃষ্ঠা ৩৪

একটি মব নাটক – পৃষ্ঠা ৩৭

খাকসার ইউনিফর্মে তরুণ

এমামুয্‌যামান

সূচিপত্র

- *সম্পাদকীয় ------------------------- ১*
- *পাথেয় ----------------------------- ৩*
- *তেহরিক-ই-খাকসার ও মহামান্য এমামুয্যামান ------------------------ ৪*
- *বিপ্লবীদের অজানা ইতিহাস --------- ১৫*
- *৫ আগস্টের স্মৃতি ------------------ ২০*
- *তারা জানতে চাইল ---------------- ২২*
- *প্রশিক্ষণ কর্মশালার দিনগুলো? ------ ২৩*
- *প্রশিক্ষণে কেটেছে জড়তা ----------- ২৪*
- *রুটিনের বাইরে সাতদিন ----------- ২৫*
- *গোড়াইয়ের প্রত্যাদেশ ------------- ২৬*
- *কুইজ ------------------------------ ২৬*
- *যেভাবে অনলাইন বালাগ প্রশিক্ষণ --- ২৭*
- *মানতের ফল ----------------------- ২৯*
- *অলৌকিক ঘটনা -------------------- ৩০*
- *বালাগে বাধা ----------------------- ৩১*
- *কারাগারে ২৮ দিন ----------------- ৩৪*
- *রংপুর হামলার পাঁচ মাস ------------ ৩৫*
- *পাবনায় জামিন পেলেন তিন সদস্য – ৩৫*
- *দীর্ঘ ১৬ বছর পর ------------------ ৩৬*
- *একটি মব নাটক ------------------- ৩৭*
- *ভ্রমণ কাহিনী ----------------------- ৩৯*
- *তথ্য প্রযুক্তি ----------------------- ৪২*
- *ইতিহাস ---------------------------- ৪৩*
- *সাহিত্য ----------------------------- ৪৫*
- *শুভাকাঙ্ক্ষীদের মন্তব্য --------------- ৪৭*
- *এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী --- ৪৮*

সম্পাদকীয়

আমাদের জীবন হোক উম্মতে মোহাম্মদীর জীবন

উম্মতে মোহাম্মদী জাতির চরিত্র কেমন ছিল তার একটি চিত্র আমরা মহামান্য এমামুয্যামানের লেখাগুলোতে পাই। তাঁর পুণ্য লেখনির ছোঁয়ায় হারিয়ে যাওয়া উম্মতে মোহাম্মদী জীবন্ত চরিত্রে রূপ নেয় আমাদের মানসপটে। বর্তমানে প্রচলিত ইসলামে আমরা উম্মতে মোহাম্মদীকে বিচিত্র রূপে জানতে পারি। জেহাদবিমুখ সুফিবাদী ইসলামে উম্মতে মোহাম্মদীর চরিত্র অন্তর্মুখী, অলৌকিক গুণাবলিসম্পন্ন, তারা আশেকে রাসুল, বুজুর্গ, রসুলের ভক্তবৃন্দ। আবার রাজনৈতিক ইসলামের প্রচারকদের বর্ণনায় উম্মতে মোহাম্মদী যেন একদল ভোটার, তাদের কাজ মিছিল মিটিং করা আর ইসলামী দলের মার্কায় ভোট দেওয়া। এদিকে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের কাছে উম্মতে মোহাম্মদী একটি নাম মাত্র। তাদের কাছে মো'মেন যা, মুসলিম তা, উম্মতে মোহাম্মদীও তা-ই। তারা নামের আগে মোহাম্মদ লেখেন, হিন্দুরা লেখেন শ্রী- এটুকুই পার্থক্য।

কিন্তু এমামুয্যামান এই জাতি সম্পর্কে লিখেছেন, রসুল (দ.) সারা জীবনের সাধনায় এমন একটি জাতি গঠন করলেন যেটাকে একটি জাতি না বলে বরং একটি 'সামরিক বাহিনী' বলাই সঠিক হয়। আল্লাহর নির্দেশে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জাতিকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে জাতির প্রতিটি সদস্য মৃত্যু-ভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হল। সমস্ত জাতিটির মধ্যে একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যেত না যার গায়ে একাধিক অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সালাত হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদীর চরিত্র গঠনের ছাঁচ (Mould)। এই ছাঁচে ঢালাই করে যে চরিত্র গঠন করা হয়, তাতে হাজারো রকম উদ্দেশ্য থাকলেও সর্বপ্রধান হচ্ছে সামরিক শৃঙ্খলা।

এমামুয্যামান বলতেন, একজন দক্ষ সার্জন যেমন অপারেশনের সময় সংবেদনশীল অঙ্গগুলোকে অক্ষত রেখে কেবল রোগাক্রান্ত অংশটুকু অপসারণ করেন, তেমনি

ইসলামের ইতিহাস থেকে জেহাদ বা সামরিক দিকটিকে সাবধানতার সঙ্গে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে জাতিটি সম্পূর্ণরূপে নির্বীর্য, ভীরু, কাপুরুষ, সংগ্রামবিমুখ একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই ভীরু জাতিকে আবার সেই দুর্বার, দুর্বীনিত, দুর্ধর্ষ, শত্রুর হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করার মতো সুকঠিন কাজটি আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। কারণ হেযবুত তওহীদ রসুলাল্লাহর (সা.) আগমনের উদ্দেশ্য, উম্মাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝে রসুলাল্লাহর উপর আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে জেহাদ, সর্বাত্মক সংগ্রাম। তাই ইসলামের আকিদা উপলব্ধি করলে জাতি তার সেই হারানো চরিত্র ফিরে পাবে।

রসুলের (সা.) হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী এই সংগ্রাম করতে গিয়ে শিয়াবে আবু তালিবের মরুপ্রান্তরে কাঁটাযুক্ত গাছের ছালবাকল খেয়েছে, জুতার চামড়া ভিজিয়ে সেটা মুখে রেখে সারাদিন চিবিয়েছে, না খেয়ে রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থেকেছে, এক বাটি দুধ সত্তরজনে ভাগ করে খেয়েছে। একটি অভিন্ন লক্ষ্য, একজন নেতা, একটি বিশ্বাস তাদেরকে এমন একটি সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক জীবনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের শতকরা আশিজনের কবর হয়েছে বিদেশের মাটিতে।

সেই আদর্শকে ধারণ করে হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো মো'মেন হওয়া। কারণ, আল্লাহ মো'মেনদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে তিনি মো'মেনদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে বিজয়ী করবেন। আমরা যদি নিজেদের সম্পূর্ণ জীবন ও সবটুকু সম্পদ উজাড় করে দিয়ে সংগ্রামে নামি, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ণ করবেন। বিপ্লব সংঘটনের জন্য যা যা উপকরণ দরকার হেদায়াহ, সত্যদীন, একটি নিঁখুত কর্মসূচি, একজন নেতা এসবই সবই আমরা পেয়েছি। এখন দরকার আমাদের শুধু মো'মেন হওয়া তাহলেই প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর গুণাবলী অর্জন করতে পারবো। ইনশাল্লাহ।

আখবারে তওহীদে লেখা পাঠানোর আবেদন

এবারের আখবারে তওহীদে যারা লেখা পাঠিয়েছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। স্থান সংকুলানের সীমাবদ্ধতার কারণে এবারের সংখ্যায় সবার লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত লেখাগুলো প্রকাশের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যারা আখবারে তওহীদ-এ নিজেদের লেখা প্রকাশ করতে আগ্রহী, তাদের নিচের মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে লেখা পাঠানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- বার্তা সম্পাদক

- Mail: **akhbaretawheed1995**@gmail.com
- WhatsApp: 01727-620046

আল্লাহর বাণী

আল্লাহ মো'মেনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোর'আনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (সুরা আত তওবা ১১১-১১২)।

রসুলাল্লাহর বাণী

হে মো'মেনগণ! স্মরণ রাখো যদি দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করো তাহলে উত্তম উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর জালিমদের কর্তৃত্ব দিয়ে দেবেন এবং তারা তোমাদের ওপর জুলুম করবে। যদিও তখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ দুআ করবে কিন্তু তাদের দুআ কবুল হবে না। অতএব তোমরা এ কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ো না, কেননা তা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমি অবলোকন করছি, কোনো কোনো লোক দুনিয়ায় আরাম-আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত এবং বালাগের কাজে গাফেল। তাদের অবস্থার জন্য আফসোস! আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন জীবন ক্ষণস্থায়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আখেরাতের জীবন হচ্ছে চিরস্থায়ী জীবন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। তোমরা যা করছ তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। যে তাঁর হুকুমের ওপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে সে প্রতিদান ও কল্যাণ লাভের যোগ্য। রহম-করমশীল আল্লাহ দয়ায় পরবশ হয়ে তাঁর বান্দাকে প্রাপ্যের অধিক প্রতিদান দেবেন।

এমামুয্যামানের বাণী

বিশ্বনবীর (দ:) পবিত্র দেহে ছিল যুদ্ধে জখম হওয়ার চিহ্ন, তাঁর আসহাবদের মধ্যে বোধ হয় একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিল না, বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সমস্ত শরীর অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নে ভরপুর ছিল। এই সুন্নাহই হলো সেই একমাত্র জান্নাতী ফেরকার সুন্নাহ। বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নতীদের সারা গায়ে সুঁচের দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা 'দীনুল কাইয়্যেমা'কে সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকরী করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম (জেহাদ) ও সশস্ত্র সংগ্রাম (কিতাল) করার যে সুন্নাহ বিশ্বনবী (দ:) ও তাঁর সঙ্গীরা (রা:) রেখে গেছেন সেই সুন্নাহকেই তিনি বলেছিলেন যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা আছি এবং এও বলেছেন যে, যারা এই সুন্নাহ ছেড়ে দেবে তারা আমাদের কেউ নয় অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী নয়।

এমামের বাণী

হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদাদের এখন পেটে পাথর বেঁধে, ঘাস-লতাপাতা খেয়ে মাঠে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠে নামে তবে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, আগামীর বিশ্ব আল্লাহ তাদের হাতে তুলে দিবেন। আর যদি তারা এখনো সিদ্ধান্ত না নেয় তবে আমার আশঙ্কা হয় পূর্ববর্তী জাতির মতো তাদের উপরও না আল্লাহ অন্য জাতিকে লানতস্বরূপ চাপিয়ে দেন! তাই হেযবুত তওহীদের নিবেদিতপ্রাণ ভাইবোনেরা যদি বাঁচতে চান! মাঠে থাকেন। এই মহাসত্য যতদ্রুত সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সময় হয়তো আর বেশি বাকি নাই। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আল্লাহর লানতের ভাগিদার হবেন না।

তেহরিক-ই-খাকসার ও মহামান্য এমামুয্‌যামান

রিয়াদুল হাসান

মাননীয় এমামুয্‌যামান ইসলামের বিষয় বা অন্য যে কোনো টপিকে বোল্ডলি কথা বলতেন, শুধু নিজের জীবনের কোনো গৌরবের প্রসঙ্গ আসলে যতটা সম্ভব কাটছাট করে বলতেন। আত্মপ্রচার করা তাঁর স্বভাবে একদমই ছিল না। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর অতীত জীবনের অধিকাংশ তথ্য চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। তাঁর সমবয়সীরাও বলতে গেলে সবাই পরপারে চলে গেছেন। তিনি ভীষণ সিরিয়াস ছিলেন কেবল তাঁকে আল্লাহ ইসলামের যে জ্ঞান অর্পণ করেছেন সেগুলো সংরক্ষণ ও পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে। যখন সরকারের কাছে আমাদের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি পরিষ্কার করে লিখিতভাবে প্রদান করার প্রসঙ্গ আসলো, তখন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়ও তুলে ধরা অনিবার্য হয়ে উঠল। এ সময় তাঁকে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিয়ে বলতে ও লিখতে হলো। তিনি বললেন, 'আমার বিষয়ে লিখলে তোমরা একটা শব্দ ইউজ করতে পারো, ভার্সাটাইল জিনিয়াস অর্থাৎ বহুমুখী প্রতিভা।' তিনি নিজের বিশেষ অর্জনগুলো নিজে নিজে গুনে রেখেছিলেন যেগুলো প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গনের অর্জন। তিনি বলতেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভার্সাটাইল জিনিয়াস ছিলেন, যদিও তাঁর সবগুলোই সাহিত্য, সংস্কৃতি অর্থাৎ আর্টস রিলেটেড। কিন্তু আমারগুলো একেকটা একেক ফিল্ডে।' যেমন তিনি শিকারী, ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী, পার্লামেন্ট মেম্বার, নজরুল অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, বহুসংখ্যক বইয়ের লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ, খেলোয়াড়, দেশের শীর্ষস্থানীয় রায়ফেল শ্যুটার, হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম। এই সবগুলো ক্ষেত্রে তিনি কেবল বিচরণই করেননি, কৃতিত্বের স্বাক্ষরও রেখেছেন।

খাকসারের ইউনিফর্ম পরিহিত তরুণ এমামুয্‌যামান

বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া:

আজকে আমরা তাঁর খাকসার আন্দোলনের সম্পৃক্ততা নিয়ে কথা বলব। তিনি ১৯৪৪ সনে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট (২য় বর্ষ) পড়ার জন্য ভর্তি হন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষকে নিংড়ে এই যুদ্ধের বিপুল ব্যয় চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভারত থেকে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন পাউন্ড সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করতে ভারত থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ যুবককে রিক্রুট করা হয়। এছাড়া ভারতবর্ষে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ চাল ব্রিটিশরা যুদ্ধের ফ্রন্টে সৈন্যদের রসদ হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (বেঙ্গল ফ্যামিন) দেখা দেয়, যাতে আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দুই শতবর্ষের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল।

ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য নানা দর্শন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। কেউ ছিলেন কমিউনিস্ট, কেউ নৈরাজ্যবাদী (অ্যানার্কিস্ট), কেউ হিন্দু জাতীয়তাবাদী, কেউ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, আবার কেউ ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বা শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক। পাশাপাশি মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলও ছিল, এবং অনেকে ছিলেন অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের অনুসারী। তাদের পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল এক- ব্রিটিশ উপনিবেশের অবসান।

তেহরিক-ই-খাকসার ও আল্লামা মাশরেকির দৃষ্টিভঙ্গি

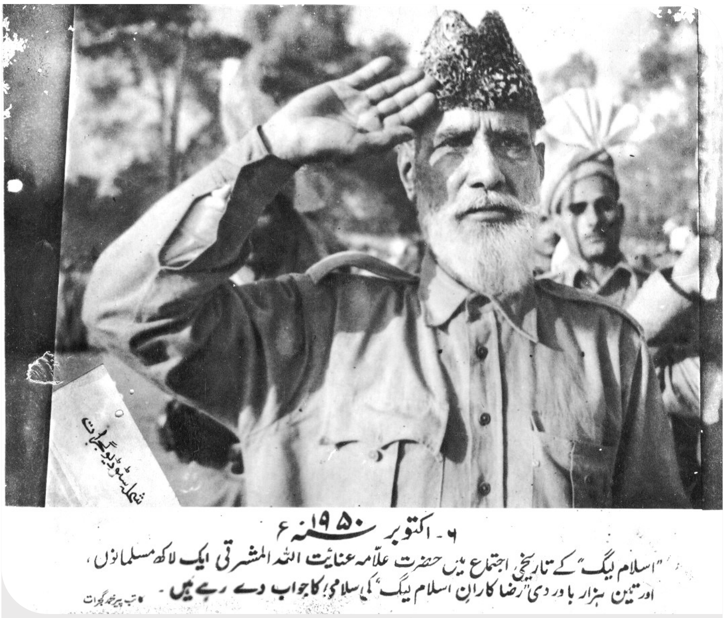

এক লক্ষ মুসলমান ও ৩ হাজার খাকসার কর্মীর সমাবেশে সেলুট গ্রহণ করছেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকি। তারিখ: ৯ অক্টোবর ১৯৫০

এমামুযযামান ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'তেহরিক-ই-খাকসার' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন আল্লামা এনায়েতুল্লাহ খান আল-মাশরেকি (১৮৮৮-১৯৬৩)। আল্লামা মাশরেকি একজন বিশ্বসেরা গণিতবিদ ছিলেন। তিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ (গণিত) পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সমস্ত পুরনো রেকর্ড ভেঙে দেন। এরপর ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যান। 'কেমব্রিজ ডেইলি নিউজ' তাঁকে 'কেমব্রিজের সেরা ভারতীয় শিক্ষার্থী' আখ্যা দেয়। ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি চারটি ভিন্ন বিষয়ে অনার্স করেন। পড়াশুনা শেষ করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর লেখা কোর'আনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক বই 'তাজকিরা'-তে (১৯২৪) তিনি মুসলমানদের দুর্দশা, ব্রিটিশদের চক্রান্ত এবং মুসলমানদের জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বইটি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু নোবেল কমিটি তাঁকে বইটি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করতে বলেন। তিনি তা অসম্মানজনক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সমগ্র জীবনে মোট নয়টি বই লিখেন।

আল্লামা মাশরেকি ১৯৩১ সালে কোর'আনের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে তেহরিক-ই-খাকসার আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'খাক' শব্দের অর্থ মাটি, আর 'সার' শব্দের অর্থ বিনম্র সেবক। "খাকসার" মানে একজন এমন মানুষ, যিনি নিজেকে মাটির মতো বিনম্র রাখেন এবং মানুষের সেবা ও জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন।" খাকসার ছিল একটি সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আদর্শভিত্তিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। আল্লামা মাশরেকি সরাসরি 'ইসলামী রাষ্ট্র' বা 'শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত ইসলামপন্থী দলগুলোর মতো বলেননি, আবার পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণাও লালন করেননি। আল্লামা মাশরেকি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশরা ভারত দখল করেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে; সুতরাং তারা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় তা মুসলমানদের হাতেই তুলে দিয়ে যাবে। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এটি ছিল একটি স্বেচ্ছাসেবাভিত্তিক আন্দোলন। এর লক্ষ্য ছিল ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা, মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা এবং হিন্দু-মুসলিম মিলে একটি অভিন্ন সরকার গঠন করা। আন্দোলনের কোনো সদস্য চাঁদা ছিল না। তবে তাদেরকে নিজেদের খরচে আন্দোলনে অংশ নিতে হতো। তারা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা ও কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন, বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করতেন না। যে কোনো বয়স, ধর্ম কিংবা শ্রেণির নারী-পুরুষ খাকসার আন্দোলনের সদস্য হতে পারত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে এটি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। আবার বহু অভিজাত, নবাব ও জমিদার পরিবারের সন্তানেরাও এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সাধারণ কর্মীদের মতো সকল কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। আন্দোলনের হাজার হাজার শাখা ভারতে এবং বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের 'আল-ইসলাহ' পত্রিকা আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, বাহরাইন, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, মিসর, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইয়েমেনসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে পৌঁছে যেত। এই পত্রিকায় আল্লামা মাশরেকির লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

খাকসার আন্দোলনের মোট সদস্যসংখ্যা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ১৯৩৯ সালের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ সংখ্যা ৫০ লাখ পর্যন্ত পৌঁছায়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে এর নিবেদিতপ্রাণ সক্রিয় সদস্য ১ থেকে ৩ লাখের মধ্যে ছিল। এই বিপুল সংখ্যক খাকসারই ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। আল্লামা মাশরেকির মনে করতেন, প্রথম শতাব্দীর ইসলামই ছিল প্রকৃত ইসলাম; আর প্রথম শতকে মাওলানা শ্রেণি ছিল না। বর্তমান যুগের মোল্লাতন্ত্র ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। এই মোল্লাতন্ত্র নির্মূল করে রসুল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু হিজরত না বোঝার কারণে খাকসার সদস্যরা সেই মহল্লার মসজিদে বেতনভোগী ইমামের পেছনেই নামাজ পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তাদের জন্য একদম বাধ্যতামূলক ছিল। প্রত্যেক মুসলিম সদস্য সঙ্গে কোর'আন রাখতেন আর হিন্দু সদস্যরা রাখতেন গীতা। সুযোগ পেলেই তারা যার যার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। এটাই ছিল তাদের রীতি। আল্লামা মাশরেকি আলেম ওলামাদের কঠোর সমালোচনা করতেন বলে এই গোষ্ঠীটি সব সময় আল্লামা মাশরেকির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গেছে এবং আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করেছে।

জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন আল্লামা মাশরেকি।

এমামুয্যামান প্রায়ই বলতেন, "ব্রিটিশরা যদি ভারতের মধ্যে কোনো একটি দলকে সত্যিকার অর্থে ভয় পেত, তবে সেটা ছিল খাকসার।" এই ভয়ের কারণ হচ্ছে, এই দলের সবকিছুই ছিল ইসলামের সামরিক বাহিনীর কায়দায়। ইসলামে যেভাবে চেইন অব কমান্ড চলে, এখানেও তেমনটাই ছিল। যেমন- একজন লিডার, যার নির্দেশ সবাইকে মানতেই হতো। কেউ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারত না। এমনকি মাত্র দুইজন সদস্য একসাথে থ াকলেও তাদের মধ্যে একজনকে কমান্ডার হতে হতো। সেই কমান্ডারকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মান্য করতে হতো। সে যোগ্য কি অযোগ্য, ছোট কি বড়, তা কেউ দেখতে পারত না। অন্য খাকসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা সামরিক কায়দায় সেলুট বিনিময় করত। তারা শহরের রাস্তায় নিয়মিত প্যারেড করত এবং যেকোনো বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করত। খাকসাররা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করত এবং মুসলিম তরুণদের মনে জেহাদের চেতনা জাগ্রত করত। ব্রিটিশ সরকার গোড়া থেকেই খাকসার আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখত। ১৯৪০ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সমর্থিত পাঞ্জাব প্রদেশ সরকার এবং ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা স্যার সিকান্দর হায়াত খান খাকসার আন্দোলনের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ১৯ মার্চ ১৯৪০ তারিখে ৩১৩ জন (বদর যুদ্ধের অনুকরণে) ইউনিফর্ম পরিহিত খাকসার লাহোরের সড়কে শান্তিপূর্ণ কুচকাওয়াজ শুরু করে। এই র‌্যালির উপর পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও খাকসার সূত্র মতে এতে প্রায় ২০০-এরও বেশি খাকসার নিহত এবং অনেক আহত হয়। একই দিন লাহোরে অবস্থিত খাকসারের সদর দপ্তরের পুলিশ ও সামরিক বাহিনী হামলা চালায়। সেখানে তারা টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, বেপরোয়া লাঠিপেটা ও মারধোর করে এবং আল্লামা মাশরেকি ও তাঁর দুই ছেলেসহ অধিকাংশ কর্মীকে আটক করা হয়। আল্লামা মাশরেকির ছেলে ইহসানউল্লাহ খান আসলম পুলিশের আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং ৩১ মে ১৯৪০ তারিখে তিনি মারা যান; তার জানাযায় অন্তত ৫০,০০০ মানুষ উপস্থিতি ছিল। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার পুরো ভারতে খাকসার আন্দোলন এবং তাদের পত্রিকা আল-ইসলাহ নিষিদ্ধ করে। এরপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কখনোও তুলে নেওয়া হয়নি। তবুও খাকসাররা তাদের কাজ চালিয়ে যায়। ফলে তাদেরকে অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, জেল জুলুমের শিকার হতে হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে এমামুয্যামানের দুর্বার নেতৃত্ব:

মাত্র উনিশ বছর বয়সেই এমামুয্যামান খাকসারে যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সহজাত নেতৃত্বগুণ ও শৃঙ্খলাবোধের কারণে তিনি আল্লামা ইনায়তুল্লাহ খান মাশরেকির নজর কাড়েন। মাশরেকি তাঁকে পূর্ববঙ্গ

অঞ্চলের খাকসার কমান্ডার (সুবা মুনাজিম) হিসেবে নিয়োগ দেন। এই দায়িত্ব পেয়ে এমামুয্যামান নিজ গ্রাম করটিয়াসহ আশেপাশের এলাকায় খাকসার আন্দোলন বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশ শাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাগ্রত করতেন, বিপ্লবের চেতনায় দীক্ষিত করতেন এবং সামরিক শৃঙ্খলায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলতেন। আন্দোলনে যোগদান ও কুচকাওয়াজের সময় খাকসাররা এই বলে অঙ্গীকার করতেন, "আমি অকপটচিত্তে ঘোষণা করছি যে, আমি ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, সালারের প্রতি আনুগত্য দেখাব, আন্দোলনের সব নীতিমালা অনুসরণ করব এবং যদি আমি এই অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হই, তবে আমি জাহান্নামের উপযুক্ত হব।"

প্যারেড করে পথ চলছে খাকসারদের একটি দল।

তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মেহেদি আলী খান পন্নী এবং চার বোন সেলিনা দোজা পন্নী, আমেনা পন্নী, হাজেরা পন্নী ও সালেহা পন্নী আন্দোলনে যোগ দেন। এছাড়া মুসাভী তরফের চাচাতো ভাই সৈয়দ আনোয়ার মুসাভি ও সৈয়দ বাবর মুসাভিও এমামুয্যামানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। এমামুয্যামানের বোনেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে নারীদের সংগঠিত করতেন। তখন জমিদারি প্রথা চালু ছিল। এমামুয্যামানের দাদা হায়দার আলী খান পন্নী ছিলেন করটিয়ার ছোট তরফের মোতওয়াল্লি। তাঁদের জমিদারবাড়িকে আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেনাবাহিনীর মতো তারা বাড়ির চত্বরের ভিতরে ক্যাম্প করে তাঁবু টাঙিয়ে থাকতেন। মেয়েদের তাঁবুগুলো ছিল অন্দরমহলের পেছনে, আর ছেলেদের তাঁবুগুলো ছিল সামনের দিকে। প্রতিদিন সকালে এমামুয্যামান বিউগল বাজিয়ে প্যারেডের জন্য সবাইকে জড়ো করতেন। বাড়ির আঙিনাতেই চলত নিয়মিত প্যারেড। সেখানে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহে প্রচুর রাইফেল, বন্দুক, শটগান ও পিস্তলসহ বিভিন্ন অস্ত্র ছিল। সেগুলো দিয়ে তাঁরা টার্গেট প্র্যাকটিস করতেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো এমামুয্যামানের নেতৃত্বে।

খাকসার আন্দোলনে ইসলামের যে চেইন অব কমান্ড সেটাই ফলো করা হতো। যেমন মাশরেকি ছিলেন হাকিমুল ইসলাম অর্থাৎ সর্বোচ্চ নেতা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা। তাঁর কাজে সহযোগিতা করার জন্য মারকাজি শুরা নামে পরামর্শ সভা ছিল। তাঁর লাহোরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দফতরকে বলা হতো মারকাজি দফতর, আর প্রশাসনিক সমন্বয়কারীকে বলা হতো মারকাজি নাজিম। আল্লামা মাশরেকির কোনো সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিল না। তিনি সরাসরি আঞ্চলিক দায়িত্বশীলদেরকে (সুবা মুনাজিম) পরিচালনা করতেন। তাঁর অধীনে জিলা মুনাজিম। তার অধীনে দস্তা মুনাজিম। দস্তা হচ্ছে ২০/২৫ জনের একটি ইউনিট। তারপর সাধারণ খাকসার সদস্য, যারা ছিল আন্দোলনের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক খাকসারকেই কোনো না কোনো আমিরের (সালার) অধীনে থাকত। দুইজন খাকসার একত্রে থাকলে তাদের মধ্যেও একজন সালার (আমির) নির্ধারণ করে নিতে হতো আর জীবন-মৃত্যুর পরোয়া না করে যে কোনো পরিস্থিতিতে তার আনুগত্য করতে হতো। এমামুয্যামান ছিলেন পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক নায়েব।

সালার-এ-খাস, হিন্দঃ

আল্লামা মাশরেকি বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না- তা সংগ্রাম করে, রক্ত দিয়ে অর্জন করতে হয়। তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করতে। কিন্তু সে সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অহিংস আন্দোলনের পথে থেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আদায়ের দেনদরবার করছিল। মাশরেকি এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এমন 'ভিক্ষার স্বাধীনতা' কখনও ভারতবাসীকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারবে না। মূলত এই চিন্তা থেকেই তিনি খাকসার আন্দোলনটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল একটি সুসংগঠিত, স্বশস্ত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ

বিপ্লবী বাহিনী গঠন করা। এই বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধের নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু সাহসী, দক্ষ ও জানবাজ প্রস্তুত কমান্ডার, যারা তার নির্দেশে দেশব্যাপী নানা গোপন ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে, স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নেবে। এই লক্ষ্যে মাশরেকি সমগ্র ভারত থেকে একশ জন দুর্ধর্ষ কমান্ডার বাছাইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এদের জন্য নির্ধারিত হয় একটি বিশেষ পদবি- 'সালার-এ-খাস হিন্দ', অর্থাৎ 'ভারতের বিশেষ কমান্ডার'। ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডার হিসেবে এমামুয্যামান খুব অল্প সময়েই নিজের সাহস, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বগুণের মাধ্যমে আল্লামা মাশরেকির আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদনের ফলস্বরূপ মাত্র ২২ বছর বয়সেই তাঁকে 'সালার-এ-খাস হিন্দ' পদের জন্য মনোনীত করা হয়। এই পদে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি মাঝেমধ্যে নানা প্রসঙ্গে খাকসার আন্দোলনের সময়ের স্মৃতিচারণ করতেন। একদিন আমি (বক্ষ্যমান নিবন্ধের লেখক) এমামুয্যামানের সঙ্গে তাঁর চেম্বারে বসে কথা বলছিলাম। আমাদের আন্দোলনের একজন আমিরের শৃঙ্খলাহীন আচরণ নিয়ে আলোচনা চলছিল, এবং এ নিয়ে এমামুয্যামান স্পষ্টতই কিছুটা বিরক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি খাকসার আন্দোলনের সময়কার একটি ঘটনা স্মরণ করে বললেন।

খাকসারের ইউনিফর্মে এমামুয্যামান

তিনি একদিন একটি ক্যাম্পে নিজ তাঁবুর ভেতরে টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। এমন সময় এক অধস্তন খাকসার কমান্ডার তাঁবুতে ঢুকে বিনা অনুমতিতে চেয়ার টেনে তাঁর সামনেই বসে পড়ে। দশাসই চেহারার লোক, বংশীয়ভাবেও প্রভাবশালী। অথচ খাকসারের শৃঙ্খলা অনুযায়ী কোনো উর্ধ্বতন কমান্ডারের সামনে অনুমতি ছাড়া বসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। নিয়ম ছিল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

লোকটি এমামুয্যামানের বয়স কম দেখে আগে থেকেই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্য দেখাত। এমামুয্যামান সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে শৃঙ্খলার একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে হবে। তিনি কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন, "তুমি অনুমতি না নিয়ে চেয়ারে বসলে কেন?" লোকটি স্বভাবতই এর কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না।

তখন এমামুয্যামান তাঁর সহকারীকে নির্দেশ দিলেন তাঁবুর ভেতর ঝুলিয়ে রাখা চাবুক দিয়ে লোকটিকে কয়েক ঘা মারতে। আদেশমতোই তাকে চাবুক মারা হয়।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এমামুয্যামান বললেন, "হেযবুত তওহীদে যদি আমি এইটা করতাম, তোমরা যারা আমির আছ মিয়ারা, সবাই সোজা হইয়া যাইতা।"

খাকসারের শৃঙ্খলা:

খাকসার আন্দোলনের একটি মূলনীতি ছিল সদস্যদের স্বনির্ভর হতে হবে। এই নীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এমামুয্যামান নিজ উপার্জনের জন্য কলকাতায় একটি ফলের দোকান চালু করেছিলেন। দলের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য খাকসার সদস্যরা সবসময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী খাকসার ডিলারদের কাছ থেকে কিনতেন। প্রতিটি খাকসার সদস্য সবসময় বেলচা সঙ্গে রাখতেন। এটি ছিল তাদের স্বনির্ভরতা ও শ্রমের প্রতীক, পাশাপাশি আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার। এর নাম তারা দিয়েছিলেন- 'সুন্নাহ', ঠিক যেভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় তলোয়ার বহন করা ছিল সুন্নাহ। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে তলোয়ার বহন করা নিষিদ্ধ ছিল, তাই আল্লামা মাশরেকি বিকল্প হিসেবে বেলচা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। এই বেলচার ব্যবহার ছিল বহুমুখী। এটা দিয়ে মাটি কাটার কাজও করা যেত, আবার এর ব্লেডের উপর রুটি সেঁকা হতো। বেলচা খাকসারদের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেলচার অপব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

কেউ যদি বেলচাকে বে-আইনী কাজে ব্যবহার করত, তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হতো। যেকোনো সেনাবাহিনীর মতো খাকসারেরও নিজস্ব খাকি রঙের ইউনিফর্ম ছিল, ব্যাজ বা প্রতীক ছিল, পতাকা ছিল। মাননীয় এমামুয্যামানের খাকসারের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় বেশ কিছু ছবি রয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে কিছু ছিল সন্ত্রাসবাদী। তারা মূলত সশস্ত্র ও গোপন কর্মকাণ্ড করত। তারা প্রায়ই ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা বা বোমা হামলা করত, তারপর "বন্দে মাতরম" শ্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তেজনা ছড়াত। কিন্তু খাকসার বিপ্লবী দল হলেও মোটেই গোপন বা সন্ত্রাসবাদী ছিল না। খাকসার একটি আদর্শবাদী দল, তারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য তৈরি হয়েছিল। দলের মধ্যে কেউ যদি কোনো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড করত তাকে কঠোরভাবে দমন করা হতো, প্রয়োজনে দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হতো, দল তার কর্মকাণ্ডের কোনো দায়ভার নিত না। এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

১৯৪৩ সালের ২৬ জুলাই, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোম্বের বাসভবনে রফিক সাবির মাজাংভি নামে এক ব্যক্তি খাকসারের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ছুরি নিয়ে তার উপর হামলা চালায়। এতে জিন্নাহর মুখ ও হাতে আঘাত লাগে। রফিক সাবিরকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আটক করা হয়। আদালতে রফিক নিজেকে খাকসার আন্দোলনের 'জানবাজ' ইউনিটের সদস্য হিসেবে দাবি করে। তবে তদন্তে তার এই সদস্যপদের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার সঙ্গে আল্লামা মাশরেকি কিংবা খাকসার আন্দোলনের কোনো সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণও পাওয়া যায়নি। ফলে আদালত আন্দোলনকে দায়ী না করে কেবল রফিক সাবিরকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। তবে যেহেতু রফিক সাবির হামলার সময় খাকসারের ইউনিফর্ম পরে ছিল, তাই এ ঘটনায় খাকসার আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইউনিফরম ও বেলচাহাতে খাকসার আন্দোলনের নারী কর্মী মিসেস মুজাফফর উদ্দিন, গুজরাট।

বুলেটের মুখে এমামুয্যামান:

এমামুয্যামান মাঝে মধ্যেই বলতেন যে আল্লাহ তাঁকে কোনো একটা বড় কাজ করানোর জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেটা কী কাজ তা তিনি জানতেন না। তবে হেযবুত তওহীদ গঠনের পর তিনি বুঝলেন, এটাই আল্লাহর আরদ্ধ সেই কাজ। নাহলে একটা ঘটনায় তাঁর বেঁচে থাকাটা ছিল একেবারেই অসম্ভব। ঘটনাটি ঘটে কলকাতায় সেদিন কারফিউ চলছিল। সেই কারফিউ অমান্য করে একদল মানুষ মিছিল করছে রাজপথে। তাদের মধ্যে এমামুয্যামান ছিলেন সম্মুখসারিতে। খাকসারের আরো অনেকেই ছিল মিছিলে, ছিল অনেক সাধারণ মানুষ, ছাত্র-জনতা। প্রথমে পুলিশ মিছিল সামনে যেতেই বাধা দেয়। জরুরি অবস্থা জারি থাকায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও রাজপথে যুদ্ধমুখী মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত ছিল। মিছিল কোনো বাধা না মেনে এগিয়ে যেতে থাকলে এক পর্যায়ে আর্মি শ্যুট টু কিল পজিশনে গিয়ে সরাসরি মিছিলে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। গুলি শুরু হতেই যা হওয়ার তা-ই হলো। সবাই পড়িমরি করে ছুটতে লাগলো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল অনেকেই। এমামুয্যামানও ভাবলেন যে তিনিও দৌড় দিবেন। এজন্য যেই না তিনি পিছনে ঘুরবেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কেউ একজন তাঁর দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে রেখেছে, তাঁকে ঘুরতে দিচ্ছে না। তিনি সোজা গুলিবৃষ্টির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর মনে একটাই চিন্তা, 'এখন যদি পিছনে ফিরি, গুলি আমার পিঠে লাগবে। মরার পর লোকে বলবে আমার পিঠে গুলি লেগেছে। পিঠে গুলি খেয়ে একজন 'পাঠান' মরতে পারে না।' তিনি বুকে হাত বেঁধে স্ট্রেইট দাঁড়িয়ে আছেন। সব গুলি তার আশপাশ দিয়ে আওয়াজ করে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! তাঁর গায়ে একটা গুলিও লাগল না। এরই মধ্যে সেখানে মিত্র বাহিনীর মার্কিন সোলজাররা এসে ব্রিটিশ আর্মির বিরুদ্ধে গুলি করতে শুরু করে, মূলত

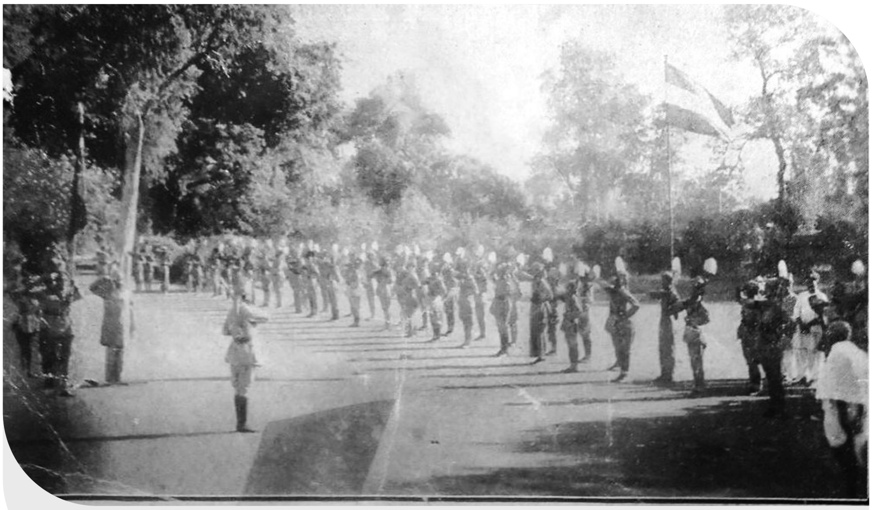

মহাত্মা গান্ধীকে সেলুট জানাচ্ছেন আল্লামা মাশরেকি ও খাকসার বাহিনী।

তাদেরকে থামানোর জন্য যেন সাধারণ মানুষের প্রাণহানী না ঘটে। এরপর গোলাগুলি থেমে যায়। এমামুয্যামান হতবুদ্ধি হয়ে যান এই আশ্চর্যজনক ঘটনায়- আল্লাহ কেন আমাকে বাঁচালেন!

এটা ছিল ১৯৪৬ সালের ১৮ আগস্টের ঘটনা। সামরিক তথ্য অনুযায়ী, কারফিউ চলাকালে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে এই দিন কলকাতায় পুলিশ ৮৭৬ রাউন্ড এবং ব্রিটিশ আর্মি ১,৯১৬ রাউন্ড গুলি ফায়ার করেছে। ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে কেন্দ্র করে ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত চার দিনের সহিংসতায় কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, এই সময় ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ জন নিহত এবং ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ জন আহত হয়। এই দাঙ্গা ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, যা ইতিহাসে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত। সুতরাং এই ঘটনায় এমামুয্যামানের বেঁচে যাওয়া যে কত বড় অলৌকিক ঘটনা সেটা আশা করি পাঠক আন্দাজ করতে পারছেন।

তিন জাতির পিতা ও এমামুয্যামান:

কলকাতায় অবস্থানকালে এমামুয্যামান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী, যুগান্তর আন্দোলনের সংগঠক ও দার্শনিক শ্রী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবিড় সাহচর্য লাভ করেন। তিনি তৎকালীন কলকাতার খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। খাকসার আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে উপমহাদেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা, মুসলিম লীগের প্রধান এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, কংগ্রেসের প্রধান ও পরবর্তীতে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

ইসলামিয়া কলেজে তাঁর পরিচয় হয় তৎকালীন মুসলিম লীগের তরুণ কর্মী ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। ১৯৪৫-৪৬ সালে তাঁরা উভয়েই কলকাতার বেকার হোস্টেলে অবস্থান করতেন। দুজনেই ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয়, যদিও তাঁদের আদর্শিক অবস্থান ছিল ভিন্ন। বর্তমানে বেকার হোস্টেলের যে রুমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবস্থান করতেন, সেটিকে তাঁর স্মৃতিকে ঘিরে একটি জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। এমামুয্যামান ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান- এই তিন দেশের জাতির পিতাদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন।

১৯৪৬ সালে ভারতজুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেয়। এই সহিংসতা থামাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আলোচনায় বসে নানা কর্মপন্থা গ্রহণের চেষ্টা করে। দেশ অচল হয়ে যাওয়ায় বৈঠক করাও কঠিন হয়ে উঠেছিল। ওদিকে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মতো দলগুলো এই দাঙ্গাকে উস্কে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। এমন এক সংকটময় সময়ে আল্লামা মাশরেকি এমামুয্যামানসহ একটি ছোট প্রতিনিধি দলকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠান। তখন দেশজুড়ে অবর্ণনীয় নৈরাজ্য। এমামুয্যামান ও

তাঁর সঙ্গীরা ছদ্মবেশে যাত্রা শুরু করেন। পথে পথে মানুষের ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে আছে, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলছে। মানুষ আতঙ্কে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কে যে কখন কাকে হামলা করে বসে বোঝার উপায় নেই। তারমধ্যে যে এলাকা দিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন সেটা ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। মুসলমান পেলে আর রক্ষা নেই, সোজা জবাই করে দিবে। এই ভয়ংকর পরিবেশ পেরিয়ে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে কয়েকদিন সময় লাগে। অবশেষে তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘসময় ধরে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। গান্ধীজি তাঁর বিখ্যাত ছাগলের দুধ তাদেরকে খেতে দিয়েছিলেন।

রেলভ্রমণের মজার স্মৃতি:

খাকসারের সদস্যরা যখন একসাথে রেল ভ্রমণ করতেন তখন তারা টিকেট কাটতেন না। এটা ছিল তাদের অসহযোগ, নন-কো আপারেশন। তাঁরা বলতেন, ব্রিটিশরা আমাদের দেশের সম্পদ লুট করে এই রেল দিয়ে পাচার করে বিলেত নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি রেলের ভাড়া দেওয়ার অর্থ তাদের সেই শোষণ লুণ্ঠনে সহায়তা করা। সুতরাং রেলের ভাড়া আমরা দিব না। তাঁরা স্টেশনে নেমে লাইন করে দাঁড়াতেন। তারপর বেলচা কাঁধে করে প্যারেড করতে করতে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়তেন। টিকেট চেকারের কোনো সাহসই হতো না তাদেরকে আটকে টিকেট চাইবার। এই গল্পগুলো করার সময় এমামুয্যামান খুব হাসতেন। খাকসার আন্দোলনের স্মৃতি তিনি কখনও ভুলতে পারতেন না। এ আন্দোলন করার সময় যাদের সঙ্গে এমামুয্যামানের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তাদের অনেকের সঙ্গেই তিনি আজীবন গভীর বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। তারাই ছিলেন এমামুয্যামানের বেস্ট ফ্রেন্ড। এদের একজনের নাম হাজি মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও আরেকজন মোহাম্মদ দস্তগীর। তারা দুজনেই ছিলেন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। হাজি মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ছিলেন পুরান ঢাকার বাসিন্দা, আর মোহাম্মদ দস্তগীর এসেছিলেন লাহোর থেকে। কিন্তু হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠার আগেই তারা দুজন এন্তেকাল করেন।

এমামুয্যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের বিপ্লবীদের সীমাহীন আত্মত্যাগের কথা বলার সময় প্রায়ই তাঁর এক হিন্দু সহপাঠী বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতেন। বলতেন মানুষ যে একটি জাতির মুক্তির জন্য কত বড় কোরবানি ও ত্যাগস্বীকার করতে পারে, সেটা তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। এমামুয্যামানের সেই বন্ধুটি খাকসারের সদস্য ছিল কিনা জানা যায় নি, তবে তিনি সম্ভবত কোনো একটি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একদিন এমামুয্যামান তাঁকে নিয়ে কোথাও দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁদের সামনে দিয়ে একটি গাড়ি দ্রুত বেগে চলে যায়। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সেনা অফিসার। এমামুয্যামান অবাক হয়ে দেখলেন গাড়ির ভেতরে বসে আছেন সেই বন্ধুর বোন। এমামুয্যামান বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন, "তোর বোন ব্রিটিশ অফিসারের গাড়িতে কেন?" বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, "আমাদের এখন অনেক অস্ত্র দরকার।" বোঝা গেল বন্ধুর ঐ বোন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য একজন নারী হিসাবে নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, তার সম্ভ্রম পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন।

বাংলাদেশের কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানও ১৯৪৩ সালে কলকাতায় অবস্থানকালে খাকসার আন্দোলনে যোগ দেন। আল্লামা মাশরেকির দর্শনের প্রভাবে তাঁর মধ্যে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, যা পরবর্তী সময়ে তাঁর শিল্পচর্চায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। (ডেইলি নিউ এইজ- ২০ অক্টোবর ২০২০)

অখণ্ড ভারতের স্বপ্নভঙ্গ:

খাকসারের পূর্ণ সামর্থ্য ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার। এটা ব্রিটিশ শাসকরাও ভালো করে জানত। তাহলে কেন আল্লামা

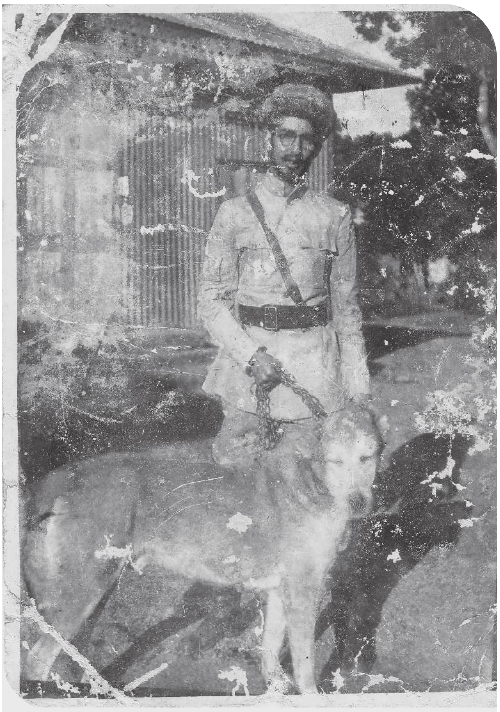

করটিয়া জমিদারবাড়িতে খাকসার ইউনিফর্মে এমামুয্যামান। সঙ্গে শিকারী গ্রে হাউন্ড।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে খাকসার তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কামান, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি করেছিল। ছবিতে খাকসার বিপ্লবীদের হাতে তৈরি দুটি ছোট কামানসহ সশস্ত্র অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

মাশরেকি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন না? কেন তিনি ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই, স্বাধীনতার মাত্র ৪২ দিন আগে আন্দোলনটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করলেন? আল্লামা মাশরেকি তাঁর বিভিন্ন লেখায় এর রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- অবিভক্ত ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন সেটা হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গার পর আর বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। এই দুটো সম্প্রদায়ের পক্ষে আর একত্রে বাস করা সম্ভব না। এদের নেতারা একে অপরের রক্তে হাত রাঙাবে, একে অপরের বাড়িঘর লুটপাট করবে। এরা নিজেরাই চায় না একসাথে থাকতে। ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই তো দেশভাগ একপ্রকার চূড়ান্ত। আর এখন ঘটনা পরম্পরায় তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা করে ইতোমধ্যেই সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এর প্রেক্ষিতে ৩ জুন ১৯৪৭ ব্রিটিশ সরকার “৩ জুন পরিকল্পনা বা Mountbatten Plan” ঘোষণা করে। এতে ঘোষণা করা হয় যে,

১. ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবে।

২. মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র (পাকিস্তান) গঠনের অনুমোদন দেওয়া হবে।

৩. ভারত ভাগ হবে ধর্মের ভিত্তিতে।

এই ঘোষণার পরই মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, ও শিখ নেতারা আলাদাভাবে দেশভাগ মেনে নেয়। মেনে নিতে পারেননি শুধু আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকি। তাই তিনি শেষবারের জন্য একটি বড় ধরনের ঝুঁকি নিলেন, যে ঘটনা প্রচলিত সরকারি ইতিহাসে খুব একটা প্রচারিত হয়নি। আল্লামা মাশরেকির নাতি খাকসার গবেষক নাসিম ইয়াসুয়াফ তার The Light in Darkness: The Untold History of Allama Mashriqi and the Khaksar Movement বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪৭ সালের জুনে আল্লামা মাশরেকির নির্দেশে প্রায় তিন লাখ খাকসার দিল্লিতে সমাবেশের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল ভাইসরয়ের লজ, অল ইন্ডিয়া রেডিও ও সংবাদমাধ্যমগুলো দখল করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া। এই ঘটনার খবরে ব্রিটিশ সরকার, বিশেষ করে ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং এই কারণে তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুততর করেন। এই তথ্য ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’ ১ জুলাই ১৯৪৭ তারিখের প্রতিবেদনে এসেছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে তিনি কেন দিল্লি দখল করেননি? সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়- তাঁকে শুধু সরকারের পক্ষ থেকেই নয়, বরং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও বাধা দেওয়া হয়েছিল, যারা ইতিমধ্যে মনে মনে ক্ষমতার মসনদে বসে পড়েছিল।

একটা পর্যায়ে আল্লামা মাশরেকি বাস্তবতা মেনে নিলেন। তিনি বুঝলেন, দেশভাগের সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তখন আর অবিভক্ত ভারতের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। দেশভাগ হতে পারে, কিন্তু সামরিক আন্দোলন তো ভাগ হতে পারে না। তাই তিনি পরিবর্তিত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দল ভেঙে দেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তখনকার বাস্তবতায় দেখা গেল- ব্রিটিশদের তৈরি প্রতারক গণতন্ত্র ও সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোই খণ্ডিত ভারতবর্ষকে শাসন করা দায়িত্ব নিচ্ছে। দেশের জনগণও তাদেরকেই ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে মেনে নিয়েছে। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের আর কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই।

ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্য খাকসার আন্দোলন ১৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এখন ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছে। তাহলে আর কেন? তিনি

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ক্রেডিট নিয়ে স্বাধীনতার পর ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশ নিতে চাননি। তিনি চাইলে তা করতে পারতেন, কিন্তু এতে নতুন স্বাধীন দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

খাকসার ভেঙে দেওয়ার নেপথ্যে:

হঠাৎ করে ৪ জুলাই ১৯৪৭ খাকসার ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা পেয়ে এ আন্দোলনের সদস্যরা একেবারে নির্বাক হয়ে যান। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সবার মুখে এক প্রশ্ন, মাশরেকি সাহেব কেন এটা করলেন? বস্তুত এ সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক কারণের চাইতেও আরও গভীর এক কারণ ছিল। সেটা এমামুয্যামান বলে গেছেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আল্লামা মাশরেকি একশ জন বিশেষ কমান্ডার অনুসন্ধান করে যাচ্ছিলেন যারা প্রত্যেকে হবে শাহাদাতের জন্য লালায়িত, মৃত্যুভয়হীন, জানবাজ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। যাদের পদবি ছিল- সালার-এ-খাস, হিন্দ। যে কোনো বিপদ্‌জনক কাজ তারা সম্পন্ন করতে পারবেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে তিনি বাছাই করে করে ৯২ জন তরুণকে খুঁজে পেয়েছিলেন যাদেরকে তিনি 'সালার-এ-খাস, হিন্দ' পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। আমাদের মহামান্য এমামুয্যামান ছিলেন তাদেরই একজন। ১০০ জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে আর মাত্র ৮ জন দরকার ছিল। এমন অবস্থায় তিনি দল ভেঙে দিলেন। এরপর এক একান্ত বৈঠকে আল্লামা মাশরেকি বলেছিলেন, "যে ৪০ কোটি ভারতবাসী আমাকে ১০০ জন কমান্ডার দিতে পারল না, তাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েও লাভ নেই। তারা এই স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারবে না। তারা এর যোগ্য না।" এটাই ছিল খাকসার ভেঙে দেওয়ার আসল কারণ।

স্বাধীনতার সময় ভারতে মোট মুসলমানই ছিল ১০ কোটি। তারা যদি ভারতের অখণ্ডতা চাইত, তাহলে এটা কঠিন ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা হারিয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে খাকসার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অর্থ নেই। তিনি বুঝেছিলেন, এই মুসলমানেরা দলে দলে উদ্বাস্তু হবে কিন্তু জেহাদ করবে না। তারা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর। তারা অনেকেই ভাবছে মুসলমানদের আলাদা দেশ হলে সেখানে তারা স্বাধীনমত আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে পারবে। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো যখন স্বাধীন হওয়ার তিন দিন আগেই ১১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন যে, 'Religion or caste or creed has nothing to do with the business of the state. অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি বা বর্ণের কোনো ভূমিকা থাকবে না।' এই ঘোষণার পর অনেকেরই চোখ খুলে যায়, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না- দেশভাগের ট্র্যাজেডি ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। দেশভাগের পর এমামুয্যামান করটিয়ায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন; তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সংশপ্তক মাশরেকি:

ওদিকে এক বছর যেতে না যেতেই আল্লামা মাশরেকি পাকিস্তানে চালু করা পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের কড়া সমালোচনা আরম্ভ করেন। তিনি ইসলামভিত্তিক একটি আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য খাকসার আন্দোলনকে পুনরায় সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। খাকসাররা ফের রাস্তায় প্যারেড, বক্তৃতা এবং ট্রেনিং আরম্ভ করলে সরকার এটিকে "সামরিক হুমকি" হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এদিকে খাকসারের পক্ষ থেকে ভারত থেকে ১৫/১৬ জনের একটি টিম করটিয়া রাজবাড়িতে এসে মাননীয় এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা এমামুয্যামানকে খাকসারে সক্রিয় হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এমামুয্যামান আর রাজনীতিতে ফিরতে রাজি হননি। কেননা দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর এখন পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

এমামুয্যামান ও তাঁর বাবা মেহেদি আলী খান পন্নীকে সেলুট করছেনভারত থেকে আসা খাকসার প্রতিনিধি টিম।

পাকিস্তানে মাশরেকি তাঁর আন্দোলন জোরালোভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জা ও প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির সরকারকে স্বৈরাচার, ইংরেজপন্থী ও ইসলামবিরোধী বলে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এসব কারণে তাঁকে ১৯৫৭ সালের ২৮ জুলাই লাহোরে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের প্রধান কারণ ছিল আদর্শিক দ্বন্দ্ব। কোনো আইনভঙ্গের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে সরকার আনতে পারেনি। তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে রাজবন্দী হিসাবে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেফতারের ফলে খাকসার আন্দোলন আবারও বড় ধরনের ধাক্কা খায়।

আল্লামা মাশরেকিকে লাহোরসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়। তিনি যাতে কারো সাথে কথা বলতে না পারেন, বা লিখতে না পারেন সেজন্য ছিল কড়া নজরদারি। তার মধ্যেও তিনি ঝুঁকি নিয়ে নানা উপায়ে জেলখানায় বসে আন্দোলন পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। দীর্ঘ বন্দি জীবনে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। দুই বছর পর বিচার না করেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এটা আসলে মুক্তি ছিল না। জেল থেকে এনে তাঁকে পুলিশ প্রহরায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সাক্ষাৎ, বক্তৃতা, লেখালেখি সব বন্ধ। অবশেষে, ১৯৬৩ সালের ২৭ আগস্ট, ৭৩ বছর বয়সে লাহোরে নিজ বাড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও সরকার তাঁকে কোনো সম্মান বা স্বীকৃতি দেয়নি। চরম অবহেলা ও চিকিৎসার অভাবে তিনি মারা যান, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের আদর্শ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। তাঁর জানাজায় এক লক্ষের উপরে মানুষ সমবেত হয়েছিল। মহান আল্লাহ পাক আল্লামা মাশরেকিকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন।

শেষ কথা:

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী একটি জঘন্য অপপ্রচার ছড়িয়েছে। তারা বলছে যে, এমামুয্যামান নাকি আল্লামা মাশরেকির বইপত্র পড়ে সেখান থেকেই হেযবুত তওহীদের আইডিয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি মাশরেকির শাগরেদ, মাশরেকির লেখা থেকে চুরি করে সেটাকে নিজের জ্ঞান বলে প্রচার চালিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমামুয্যামান তরুণ বয়সে আল্লামা মাশরেকির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জেহাদ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই জেহাদের স্বাদ তিনি খাকসারের বছরগুলোতে লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ মহামান্য এমামুয্যামানকে ইসলামের প্রকৃত আকিদার জ্ঞান দান করতে থাকলেন, তখন তিনি খাকসারের কোথায় কোথায় ভুল ছিল সেগুলোও চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। নাহলে তিনি নিশ্চয়ই আল্লামা মাশরেকি যখন খাকসার পুনর্গঠনের জন্য ডাক দিলেন, এমনকি করটিয়াতে প্রতিনিধি পাঠালেন, এমামুয্যামান তো ফিরে যাননি? কিন্তু তিনি সবসময় আল্লামা মাশরেকির প্রতি শ্রদ্ধা লালন করেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান বজায় রেখেই তাঁর কর্মপন্থার সমালোচনা করেছেন, তাঁর আকিদাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। অন্ধভক্তির আতিশয্য কখনই তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। আর যাঁরা এমামুয্যামানের লেখা পড়েছেন বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, তিনি কখনোই অন্য কারও বক্তব্য বা লেখাকে নিজের নামে চালিয়ে দিতেন না। বরং তিনি সবসময় যেখান থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতেন, অকপটে ঋণস্বীকার করে সেটার রেফারেন্স উল্লেখ করতেন।

বস্তুত মহামান্য এমামুয্যামানের জীবনে খাকসার আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রথম যৌবনে এই দল তাঁকে মানুষ ও মুসলিম হিসাবে জীবনের বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। আল্লামা মাশরেকির চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের মাধ্যমে তিনি সত্য ও সঠিক ইসলামের অনেক দিক আবিষ্কার করেন, যা তাঁর মননে গভীর প্রভাব ফেলে। খাকসার তাঁর সহজাত নেতৃত্বগুণ, বলিষ্ঠ চরিত্র ও সামরিক শৃঙ্খলার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বলা চলে, বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম পাঠ তিনি লাভ করেছিলেন খাকসারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মাশরেকির 'গুরুকুল' থেকেই। তাঁর অন্তরে জেহাদ ও শাহাদাতের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। তিনি বলতেন, "ইসলামে জেহাদের যে সঠিক জায়গা, সেটা পৃথিবীর কোনো ইসলামী সংগঠনই দিতে পারেনি। এদিক থেকে খাকসার এগিয়ে ছিল। তাদের কাছে মিলিটারি লাইফ ছিল ফার্স্ট প্রায়োরিটি।" তিনি সারাজীবন অকুণ্ঠচিত্তে আল্লামা মাশরেকির ঋণ স্বীকার করে গেছেন। সেই সাথে তিনি এটাও বলেছেন, "খাকসার আল্লাহর মনোনীত বা পরিচালিত আন্দোলন ছিল না, তাই তার কর্মসূচিও সঠিক ছিল না। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য লাভ ও চূড়ান্ত সফলতা তাদের ঘটেনি।"

এমামুয্যামানের এক অযোগ্য অনুসারী হিসাবে আমার চোখে খাকসারের সবচেয়ে বড় অর্জন এটাই যে, এই দল এমন একজন মহামানবকে ধারণ করেছিল, বিশ্ব মানবতার মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যার অনুসারীদের মাধ্যমে একদিন সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে - ইনশাআল্লাহ।

বিপ্লবীদের অজানা ইতিহাস

পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিলেন যারা!

আদিবা ইসলাম

যুগে যুগে ইতিহাসে যত বড় বড় বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, সেগুলোর নেপথ্যে থাকা বিপ্লবীদের জীবনে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবের প্রেক্ষাপট বা সময়কাল ভিন্ন হলেও, বিপ্লবী চরিত্রগুলোর জীবন যেন এক সুতোয় গাঁথা। তাদের জীবনে ছিল অবিরাম সংগ্রাম, চরম দারিদ্র্য, অব্যাহত জেল-জুলুম আর নিঃস্ব জীবনের বাস্তবতা নিয়ে। বলতে গেলে একপ্রকার বেদুইন-ভাসমান জীবন। আজ এখানে তো কাল ওখানে। পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে চলাফেরা ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। যে জীবনকে আমরা 'স্বাভাবিক' বা 'স্থিতিশীল' বলে মনে করি, বিপ্লবীদের জীবনে তার কোনো স্থান ছিল না। কারণ, বিপ্লব মানেই তো এক ধরনের ঝড়। যে ঝড়ে ভেঙে পড়ে সমাজের জীর্ণতা, অন্যায় প্রথা, বৈষম্য আর গড়পড়তা নিয়মকানুন। সেই বিশৃঙ্খলার বিনিময়েই জন্ম নেয় এক নতুন সময়, এক নতুন ইতিহাস। আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লব কিংবা বিশ শতকের রুশ বিপ্লব যেটার কথাই বলি বাস্তবে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে কিছু মানুষের আত্মত্যাগ, বলিদান ও সংগ্রামের বিনিময়ে। যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে বৃহত্তর কল্যাণের কাজে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা হেযবুত তওহীদও আবারও একটি নতুন বিপ্লব ও রেনেসাঁ ঘটানোর জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। তাই আমাদের চলার পথেও নানা সংকট আসবে, ছন্দপতন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ আমরাও যে তাদের উত্তরসূরী।

এবারের সংখ্যায় আমরা ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী একজন মহান বিপ্লবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানব। আমাদের আজকের বিপ্লবী নায়ক মহান কম্যুনিস্ট নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। ১৯১৭ সালে লেনিন রাশিয়ায় যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল তার শুরুটা হয়েছিল আরও বহু আগে। রুশ জনগণ দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ, ক্ষুধা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং জার সরকারের দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ভিতরে ভিতরে একটি মহান বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যার সর্বশেষ আঘাত হানে লেনিন।

লেনিন জন্মেছিল ২২ এপ্রিল ১৮৭০ সালে রাশিয়ার সিম্বিরস্কের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ১৮৮৭ সালে রাশিয়ার রাজা জার আলেকজান্ডার তৃতীয়কে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তার প্রাণপ্রিয় ভাই আলেকজান্ডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তা লেনিনের চিন্তাজগতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে এবং তাকে রাজনীতির পথে ঠেলে দেয়। কারণ লেনিন মনেপ্রাণে তার ভাইকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করতেন এবং তার বিপ্লবী

চেতনা দ্বারা বরাবরই উজ্জীবিত হতেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর লেনিন প্রথম উপলব্ধি করেন যে রাজতন্ত্র (Tsarism) অন্যায়ভাবে মানুষকে দমন করছে তাই এই ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হবে। লেনিনের সময় রাশিয়ার সমাজ ছিল চরম বৈষম্য ও শোষণে পরিপূর্ণ। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে জার শাসনের অধীনে দমন-পীড়নের শিকার হত। কৃষকেরা জমির অভাবে জমিদারদের কাছ থেকে "কিস্তিতে" জমি কিনতে বাধ্য হত। তারা এত উচ্চহারে সুদসহ কিস্তি দিত যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঋণমুক্ত হতে পারত না। ফলে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে সারাজীবন দাসের মতো জীবন কাটাত। অনেক কৃষক ক্ষুধায় মারা যেত বা আত্মহত্যা করত। শিল্প শ্রমিকেরা প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেও মজুরি পেত খুবই কম, আর শ্রম-অধিকারের কোনো সুরক্ষা ছিল না। দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলেও মালিকরা দায়িত্ব নিত না। শিশুরাও কারখানায় অমানবিক পরিশ্রম করত। সমাজে ধনী ও গরিবের মধ্যে ছিল ভয়াবহ বৈষম্য। একদিকে অভিজাতরা বিলাসে জীবন কাটাত, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পেত। শিক্ষা ছিল কেবল ধনীদের জন্য; গরিবদের কাছে তা ছিল অধরা। যারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলত, তাদের গ্রেফতার করে জেল-নির্বাসনে পাঠানো হতো কিংবা নির্যাতন চালানো হতো। সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশ ছিল সেন্সরশিপের আওতায়, ফলে কেউ প্রতিবাদ করতে পারত না। এই শোষণ-জুলুমের পরিবেশই লেনিনকে বিদ্রোহী করে তোলে এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়।

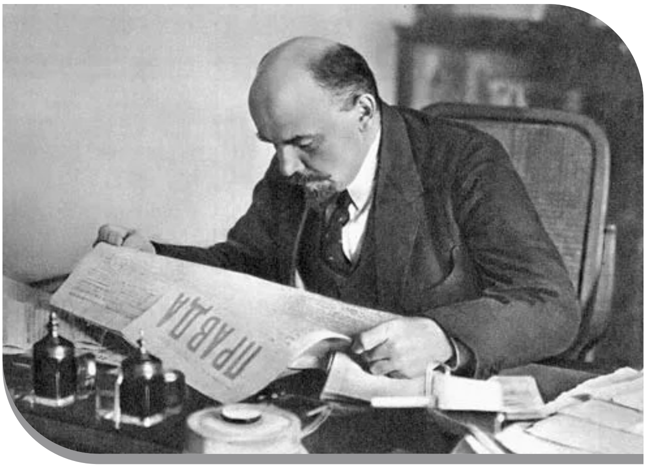

১৮৮৯ সাল থেকে লেনিন পুরোপুরি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে পড়া মেধাবী শিক্ষার্থী লেনিনকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৮৯ সালের মে মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ তাদের গোটা পরিবারের সঙ্গে কাজান থেকে সামারা গুবের্নিয়ায় চলে আসেন। এখানে তার কাটে সাড়ে চার বছর। গরমকালে তারা থাকতেন আলাকায়েস্কা গ্রামের কাছে খামারবাড়িতে, শরতে চলে আসতেন সামারায়। এই সময়টা তিনি কাটিয়েছেন নিরলস পাঠে। মূলত এই সময় থেকেই লেনিন অক্লান্তভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা অধ্যয়ন চালিয়ে যান ও বিদেশী ভাষা শিখতে থাকেন, বিশেষ করে জার্মান ভাষা। এই সময়েই মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি কর্মসূচিমূলক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' তিনি জার্মান থেকে রুশীতে অনুবাদ করেন। হাতে লেখা এই অনুবাদ পড়া হত বিপ্লবী যুবকদের চক্রে। নিজের শিক্ষা ভ্লাদিমির ইলিচ দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যান। গ্রীষ্মকালে আলাকায়েস্কায় বাগানের ঘন লাইম-বীথির এক কোণে ছায়াঘেরা একটা জায়গা ছিল। যেখানে একটি কাঠের বেঞ্চি আর টেবিল ছিল। লেনিনের বড় বোন আন্না ইলিনিচনা বলেছেন, 'সকালে চায়ের পর বইয়ের বোঝা নিয়ে সেখানে সে যেত এমন কাঁটায় কাঁটায় যেন খুব কড়া এক মাস্টার বুঝি বা অপেক্ষা করে আছেন। দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত নির্জনে সারা সময়টা তার ওখানেই কাটত।'

দেড় বছরের মধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ্যসূচি নিজে নিজেই পড়ে শেষ করেন। ১৮৯১ সালে এক্সটারনাল ছাত্র রূপে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষায় চমৎকার উত্তীর্ণ হন ও প্রথম বিভাগের ডিগ্রি পান। ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে লেনিন পিটার্সবুর্গ ফেরেন। আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে তিনি বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায়ই সভা চালাতেন, আলাপ করতেন শ্রমিকদের সঙ্গে। জার পুলিশের নজর এড়িয়ে চমৎকার ধোঁকা দিতেন তিনি, গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বহুবার বাসা বদল করেন। পরিচয় গোপন করতে প্রায় সময়ই ব্যবহার করতেন ছদ্মনাম। তুলিন, ইলিন, ফ্রিম্যান, ইভানোভ, পেতরভ, স্তারিক, বাস্তিলেভ সবই ছিল তার ছদ্মনাম। এমনকি লেনিন নামটাও তার ছদ্ম। পরিচয় লুকাতে চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকায়, লেখালেখিতে তিনি এসব নাম ব্যবহার করতেন।

শুধুমাত্র ছদ্মনামেই নয়, ছদ্মবেশেও চলাফেরা করতেন লেনিন। বিশেষ করে পুলিশি নজরদারি এড়াতে, গোপন বৈঠকে যেতে বা সীমান্ত পেরোতে লেনিন বহুবার নিজের বেশভূষা ও চেহারার পরিবর্তন করেছিলেন পরিচয় গোপন রাখতেন এবং এটা ছিল তার বিপ্লবী জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কখনো তিনি দাড়ি রাখতেন বা কাটতেন, মাথা কামাতেন বা টুপি পরতেন, সাধারণ শ্রমিকের পোশাক পরতেন, বিদেশি ভাষায় কিছু কথা শিখে নিতেন, দেহভঙ্গি বা হাঁটার ধরনও বদলে ফেলতেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সফল করতে তাকে জীবনের অনেক অংশই অভিনয় করে কাটাতে হয়েছে।

১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় লেনিন সমেত তার কর্মীদের বৃহৎ অংশই গ্রেপ্তার হয়। 'বারোচেয়ে দেলো' (শ্রমিক আদর্শ) পত্রিকার প্রথম যে সংখ্যাটি 'সংগ্রাম সঙ্ঘের' সভ্যরা প্রস্তুত করে করেছিলেন তা পুলিশের হস্তগত হয়। লেলিনকে রাখা হয় পিটার্সবুর্গ জেলে। একক কক্ষে উনি কাটান ১৪ মাসের বেশি, কিন্তু জেলের গরাদের আড়ালে থেকেও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ তার থামে না। 'সংগ্রাম সঙ্ঘ'কে পরিচালনার উপায় তিনি বের করেন। কারারুদ্ধ সময়টিতে তিনি মুক্ত কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, চিঠি, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা লিখে তা বাইরে পাঠাতেন। জেলে বসেই লেনিন লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচি। বিপ্লবী দলিলপত্র লেনিন লিখতেন বই ও পত্রপত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে দুধ দিয়ে। এমনিতে তা চোখে পড়ত না, কিন্তু কাগজটা আগুনে গরম করলে তা বেশ ফুটে উঠত। বিপ্লবীরা এই পদ্ধতিতে তখন প্রায়ই পত্রালাপ চালাতেন। রুটি দিয়ে 'দোয়াত' বানাতেন লেনিন, তাতে দুধ থাকত। পরিদর্শক এলেই সেটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলতেন। তার একটি পত্রে লেনিন পরিহাস করে লিখেছিলেন, 'ছয়টি দোয়াত আজ খাওয়া গেল।'

ভ্লাদিমির ইলিচের চিঠিগুলি উদ্দীপিত ছিল সজীবতায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের উপর বিশ্বাসে। বাইরে পাঠানো প্রতিটি চিঠিতেই ফুটে উঠত কমরেডদের প্রতি তার উদ্বেগ। সর্বদা তিনি নির্দেশ পাঠাতেন- অমুকের জন্য গরম কাপড় জোগাড় করো, অমুকের জন্য 'কনে' চাই, অমুক কমরেডটি নিঃসঙ্গ, কেউ তার কাছে যায় না, মেয়েটি যেন মাঝে মাঝে দেখা করে আসে। জেলেই লেনিন শুরু করেন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ'। এ বইয়ের মালমশলা সংগ্রহের জন্য শত শত বই ও পত্রপত্রিকা পড়েন তিনি। আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠিতে তিনি প্রয়োজনীয় পুস্তকের ফর্দ পাঠাতেন। সে সব বই জেলে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন দিদি আন্না ইলিনিচনা। নিজের জন্য কঠোর রুটিন বেঁধেছিলেন লেনিন। প্রতিটি দিনই ছিল কাজে ভরা, আর ঘুমোবার আগে চলত তার নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা। ভ্লাদিমির ইলিচ পরে স্মরণ করে বলেছেন, 'ভয়ঙ্কর শীতে কামরা যখন একেবারে ঠাণ্ডা তখন দিব্যি কসরত করে গরম হয়ে নেওয়া যেত, তারপর ঘুম যা হত তোফা।' আসন্ন সংগ্রামের জন্য তিনি শুধু ভাবাদর্শের দিক থেকে নয়, দৈহিকভাবেও নিজেকে পোক্ত করে তুলছিলেন এবং সহকর্মীদেরও সেই শিক্ষা দিতেন।

১৮৯৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসনাজ্ঞা জানানো হল লেনিনকে। লেনিনের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য জার সরকার এইভাবে নির্যাতন চালাতে লাগল তার উপর। ১৮৯৭ সালের মে মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর নির্ধারিত নির্বাসনস্থল ইয়েনিসেই গুবের্নিয়ার মিনুসিনস্ক এলাকার শুশেনস্কয়ে গ্রামে আসেন। সে সময় এটা ছিল-রেল লাইন থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে এক অজ সাইবেরীয় গ্রাম। এক বছর পরে শুশেনস্কয়ে গ্রামে আসেন নাদেজদা কনস্তানতিনোভনা ক্রুপস্কায়া। পিটার্সবুর্গের 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম সঙ্ঘের' ব্যাপারে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং উফা গুবের্নিয়ায় নির্বাসিত হন। কিন্তু লেনিনের বাগদত্তা বধূ হিসাবে তিনি শুশেনস্কয়েতে থাকার অনুমতি পান। এখানে তাদের বিয়ে হয়। নাদেজদা ক্রুপস্কায়াও ছিলেন একজন কমরেড ও আদর্শ বিপ্লবী। তিনি শুধু লেনিনের স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ এবং লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। নির্বাসনকালীন সময়ে লেনিন আত্মীয়স্বজন ও কমরেডদের সহায়তায় তার বইপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব সাহিত্য সংগ্রহ করতেন। গ্রামের নিদ্রাতুর অন্ধকারে গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বলত তার ঘরে।

নির্বাসন থাকাকালে লেনিন প্রস্তুত করেন পার্টির খসড়া কর্মসূচি, লেখেন তিরিশটিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে 'রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের কর্তব্য' নামক পুস্তিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হলে ১৯০০ সালের ২৯ শে জানুয়ারি সকালে ভ্লাদিমির ইলিচ সপরিবারে শুশেনস্কয় ছাড়েন। লম্বা পথ: প্রায় ৩০০ কিলোমিটার ঘোড়ায় যেতে হয়। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও দিনরাত সমানে চলতে থাকেন কারণ বাইরের সক্রিয় বিপ্লবী কাজে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় যোগ দেবার জন্য লেনিনের আর তর সইছিল না। ছাড়া পাবা মাত্রই লেনিন তার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। গোটা ১৯০০ সাল কাটে একটা সারা-রুশ রাজনৈতিক পত্রিকা সংগঠনের অক্লান্ত কাজে। সে সময় পুলিশের পীড়নের জন্য রাশিয়ায় বিপ্লবী শ্রমিক পত্রিকা স্থাপন করা ছিল প্রায়

অসম্ভব। তাই বিদেশ থেকে তা প্রকাশের সংকল্প করেন লেনিন। ১৯০০ সালের ১৬ই জুলাই তিনি চলে যান জার্মানিতে; শুরু হল তার প্রথম দেশান্তরী জীবন, যা চলে পাঁচ বছরেরও বেশি। সেখান থেকে ছাপানো শুরু করেন বিপ্লবী পত্রিকা 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ)। জার পুলিশের গোয়েন্দারা যাতে 'ইস্ক্রা' প্রকাশের আসল জায়গা টের না পায় তাই রাশিয়ার সঙ্গে তার সমস্ত চিঠিপত্র যেত প্রাগ হয়ে। লেনিনের সমস্ত মন তখন ছিল পত্রিকা প্রকাশেই নিবদ্ধ। ছাপানোর পয়সা, ছাপাখানার জায়গা সবকিছু ব্যবস্থা করতে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটরা তাকে প্রচুর সাহায্য করে।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় 'ইস্ক্রা'র প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ায় জ্বলে উঠে বিপুল বিপ্লবী আগুন। তার শিখায় ভস্মীভূত হয়ে যায় জার স্বৈরাচার আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। কিন্তু রাশিয়ায় পত্রিকাটি পাঠানো ছিল খুবই কঠিন। জার্মানি থেকে রাশিয়াতে পত্রিকা পাঠাবার সুবিধার জন্য তা ছাপানো হত শক্ত পাতলা কাগজে। পুলিশের হাত এড়াবার জন্য 'ইস্ক্রা' যে প্রক্রিয়ায় রাশিয়ায় পাঠানো হত তা ছিল রুদ্ধশ্বাস ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। সব স্যুটকেসে পাঠানো হত, তার থাকত দুটি করে তল। আস্থাভাজন ঠিকানায় পাঠানো বইয়ের মলাটের ভেতরে তা চালান যেত, সেলাই করে দেওয়া হত রাশিয়া-যাত্রী কমরেডদের ওয়েস্ট কোটের লাইনিঙের ভেতর। সীমান্ত পার করার সময় কাগজগুলো কখনো মালপত্রের ভেতরে, কখনো মেয়েদের জামার ভাঁজে, আবার কখনো জুতার ভিতর করে লুকিয়ে আনা হতো। বিপ্লবীরা বিভিন্ন ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে (শ্রমিক, দোকানি, মহিলা পর্যটক) ইস্ক্রার বান্ডিল বহন করতেন। বিপদের আশঙ্কা থাকলে তারা ইস্ক্রার কপি পুড়িয়ে ফেলতেন বা গোপন স্থানে ফেলে দিতেন। কখনো জার্মানি থেকে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ফিনল্যান্ড, তারপর রাশিয়া এইভাবে রুট পরিবর্তন করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা হতো। রাশিয়ায় ইস্ক্রা ঢুকলে তা গোপন দলীয় সদস্যরা শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে দিতেন। তারা গোপনে লোকদের বাড়িতে বিতরণ করতেন, কখনো ছাদে বা গোপন ঘরে গুদাম করে কপি রাখতেন। ধরা পড়লে তাদের জেল, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হত।

১৯০৩ সালের বসন্তে লন্ডন থেকে লেনিন চলে আসেন জেনেভায়, 'ইস্ক্রা'র মুদ্রণ এখানেই স্থানান্তরিত হয়েছিল। জেনেভার উপকণ্ঠে সপরিবারে লেনিন একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া করেন। রাশিয়া থেকে আগত কমরেডদের সঙ্গে তিনি এখানেই সাক্ষাৎ করতেন। নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসার পর এদের অনেকেরই জীবনধারণের কোনো উপায় ছিল না। ভ্লাদিমির ইলিচ তাদের দেখাশোনা করতেন, যাদের প্রয়োজন তাদের আহার, বাসস্থান জোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অতি সংবেদনশীল, মনোযোগী ও হৃদয়বান লোক ছিলেন তিনি। অতিশয় ভদ্র ও মনোহর চরিত্রের মানুষ ভ্লাদিমির ইলিচ লোককে জয় করে নিতেন।

প্রবাসে থেকে লেনিন মন দিয়ে রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ অনুধাবন করতে থাকেন। বিপ্লব শুরুর অনেক আগে থেকেই তিনি তার আগমন দেখতে পেয়েছিলেন। হঠাৎ তা শুরু হল। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি পিটার্সবুর্গে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে জার নিকোলাস II-এর কাছে এসেছিল শান্তভাবে তাদের অভাব-অনটনের কথা জানাতে। ন্যায্য মজুরি, কাজের সময়সীমা, শ্রমিক অধিকার চাইতে। কিন্তু জারের হুকুমে গুলি চালানো হয় শ্রমিকদের উপর।

রাজপ্রাসাদের সামনে প্রায় ২০০ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। আহত হয় হাজারেরও বেশি। এদিন শত শত মানুষকে স্থানীয়ভাবে আটক করা হয় এবং পরবর্তী দিনে হাজারেরও বেশি কর্মী ও বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় "ব্লাডি সানডে" যা গোটা রাশিয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। জারের এই রক্তাক্ত পৈশাচিকতায় জনগণের ভিতরে ক্রমেই বিক্ষোভ ও রোষ জেগে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে শহরের শ্রমিক এলাকাগুলিতে ব্যারিকেড গড়া শুরু হয়। লেনিন এটার মূল্যায়ন করলেন বিপ্লবের সূত্রপাত বলে। তিনি লেখেন, 'হয় মৃত্যু নয় মুক্তি।' বীর পিটার্সবুর্গ প্রলেতা-রিয়েতের এই ধ্বনি এখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সারা দেশে।'

লেনিন বোঝালেন যে, জার স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের নির্ধারক উপায় হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভূতপূর্ব বিপ্লবগুলিতে যা হয়েছে সেভাবে বিজয়ী অভ্যুত্থান থেকে বুর্জোয়ার ক্ষমতা স্থাপন চলবে না, প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের ক্ষমতা। তার সংগঠন হবে সামরিক বিপ্লবী সরকার।

১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের পর লেনিনের মার্কসবাদী দল বলশেভিকরা আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে নিজেদের সংগঠন আরও মজবুত করতে কাজ করতে থাকে। এই সময় লেনিন "প্রলেতারি" (Proletary) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন, যা সম্পূর্ণভাবে বলশেভিক লাইন প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হত। অন্যান্য পত্রিকার মত এটিও বিদেশে ছাপা গত। তারপর গোপনে পাঠানো হত রাশিয়ায়। ১৯০৮ সালের শেষে 'প্রলেতারি' পত্রিকার প্রকাশনা স্থানান্তরিত হয় প্যারিসে, সে সময় এটি ছিল রুশ দেশান্তরীদের কেন্দ্র। এই উপলক্ষে লেনিন ও ক্রুপস্কায়াও সেখানে এসেছিলেন। (এইখানে মারি রোজ স্ট্রিটে ৪ নং বাড়ির যে ফ্ল্যাটে তাঁরা ছিলেন সেখানে এখন লেনিন মিউজিয়ম গড়া হয়েছে।) প্যারিসে লেনিন ও তাঁর পরিবারের জীবন কাটত খুবই কষ্টে। প্রধান 'জাতীয় গ্রন্থাগারের' বইপত্র, পত্রিকাদি পড়বার জন্য লেনিনকে প্যারিসের উপকণ্ঠের সস্তা ভাড়াবাড়ি থেকে সাইকেল করে পাড়ি দিতে হত প্রায় গোটা শহর। এতে অনেক সময় যেত। তবুও লেনিন প্রলেতারি পত্রিকা ছাপানো থেকে একদিনের জন্যও পিছিয়ে যান নি। পত্রিকার লিখা তৈরি, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ যাবতীয় কাজে তিনি অংশ নিতেন।

এতে লেনিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপ্লবী তত্ত্ব, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, কৌশল এবং শ্রমিক কৃষকদের জন্য নির্দেশনা লিখতেন। প্রলেতারি পত্রিকা সদস্যদের হাতে পৌঁছানোর জন্য বলশেভিকরা কখনো এটি বিদেশি বইয়ের কভারের ভেতর লুকিয়ে রাখত, কখনো কাপড়ের রোল, যন্ত্রপাতির বাক্স বা খাদ্যসামগ্রীর চালানে ঢুকিয়ে পাঠানো হত। কুরিয়াররা প্রায়ই ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ট্রেন বা জাহাজে করে পত্রিকা নিয়ে আসত। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট পাতায় ছাপিয়ে সেগুলো আলাদা আলাদা পাঠিয়ে দেওয়া হত। যাতে পুলিশ ধরা পড়লেও সম্পূর্ণ সংখ্যাটি না পায়। এভাবে গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রলেতারি রাশিয়ার নানা শহর ও কারখানায় পৌঁছে যেত। সেখানে শ্রমিকরা একসাথে বসে তা পড়ত এবং গোপন বৈঠকে আলোচনা করত। এই পত্রিকাই অনেক সময় স্থানীয় আন্দোলনের পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনার কেন্দ্র হয়ে উঠত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে (১৯১৪-১৯১৮) বলশেভিকরা যুদ্ধকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর লুটপাট হিসেবে নিন্দা জানায় এবং যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানায়। এতে সাধারণ শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে জার নিকোলাস দ্বিতীয় ক্ষমতাচ্যুত হলে বলশেভিকরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় হয়। নির্বাসন শেষে লেনিন দেশে ফিরে এসে "এপ্রিল থিসিস" প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ঘোষণা দেন "সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিক ও কৃষক সোভিয়েতদের হাতে দিতে হবে"। এই আহ্বান বিপ্লবের গতি আরও ত্বরান্বিত করে।

অবশেষে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বলশেভিকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে পেত্রোগ্রাদ দখল করে এবং অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করে। তারা শ্রমিক-কৃষক সরকার গঠন করে যা ছিল ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই বিপ্লব শুধু রাশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রই বদলে দেয়নি, বিশ্ব রাজনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি ছিল বিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প এবং সংগঠিত জনশক্তির জীবন্ত প্রমাণ। অকল্পনীয় দমন-পীড়ন, ঝুঁকি এবং বিপর্যয়ের মধ্যেও তারা তাদের লক্ষ্য থেকে একমুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি। প্রলেতারি পত্রিকার মতো হাতিয়ার দিয়ে তারা অন্ধকারে আলো জ্বালিয়েছে, প্রতিটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিককে বুঝিয়েছে যে ইতিহাসকে বদলানোর ক্ষমতা তাদের হাতেই আছে। লেনিন এটা প্রমাণ করেছিলেন যে, সঠিক নেতৃত্ব, সুদৃঢ় লক্ষ্য, দূরদৃষ্টি আর জনগণের একতা মিলিত হলে সাম্রাজ্যের ইস্পাত প্রাসাদও ভেঙে পড়তে বাধ্য। যদি সত্য, ন্যায় ও মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা হয় তবে তা কখনো বৃথা যায় না। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তারই জীবন্ত উদাহরণ।

৫ আগস্টের স্মৃতি

“ভয় যেন আমার গলা চিপে ধরেছিল”

শহিদুল ইসলাম শহীদ

গাজীপুরের কোনাবাড়ি কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিম পাশে আমরা একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম। সেখানে নয়টা রুমেই আমাদের ভাই বোন এবং কোনাবাড়ির থানা আমির থাকতেন। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন কোটা আন্দোলন শুরু হয় তখন অন্যান্য জায়গার মতো গাজীপুরের পরিস্থিতিও খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পুরো ঢাকাজুড়েই দাঙ্গা, ভাঙচুর, গোলাগুলি, আন্দোলন চলছিল। ৫ই আগস্ট সকাল থেকেই আমাদের এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল। আমাদের প্রতি নির্দেশনা ছিলো নিরাপদ অবস্থানে থাকার জন্য এবং কেউ যেন অকারণে বাসা থেকে বাহির না হয়।

এদিকে আমরা যে বাসায় থাকতাম সেখানে আমাদের অফিস রুমও ছিল। এলাকার লোকজন জানত যে এই বাসাতে হেযবুত তওহীদের অফিস আছে। হেযবুত তওহীদের লোকজন এই বাসায় থাকে। তাই সকাল থেকেই প্রায় ১৫/২০ জন ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। সেদিন সকাল থেকে ছোট ছোট সরকার বিরোধী মিছিল যাচ্ছিল কোনাবাড়ি অফিসের সামনে দিয়ে। এভাবেই বেলা গড়াতে লাগল। আমরা সতর্কভাবে চারদিকে খেয়াল রাখতে লাগলাম। এরইমধ্যে যখন খবর ছড়ালো যে শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে তখন শুরু হলো হৈ-হুল্লোড়, মিছিল, বাইক শোডাউন ইত্যাদি। পরক্ষণেই শুরু হলো মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। শব্দটা কোথা থেকে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছিলাম না। এদিকে আমিরদের সাথেও কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। কারণ নেটওয়ার্ক বন্ধ। ইন্টারনেট না থাকায় অনলাইনে মাননীয় এমাম কী দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন কিছুই জানতে পারছিলাম না। ফলে মনে হচ্ছিল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। এদিকে বাইরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছিল।

তাই গাজীপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে একজন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে রওনা করলাম। মেইন রাস্তায় আসতেই দেখলাম আশেপাশের লোকাল রোডগুলোতে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরানো রয়েছে। জেলখানা রোডের সামনে সেনাবাহিনীর লোকে ভরে গেছে। কারণ জেলখানা থেকে আসামি পালিয়েছে। গুলির শব্দ জেলখানা থেকেই আসছিল। এদিকে সেনাবাহিনী সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা বিকল্প একটি ছোট রাস্তা দিয়ে মেইন রোডে বের হলাম। বের হয়ে দেখলাম রাস্তায় হাজার হাজার লোক। আর রাস্তা জুড়েই টায়ার পোড়ানো হয়েছে। আগুনের ধোয়ায় আকাশে যেন কালবৈশাখীর মত মেঘ জমা হয়েছে। রাস্তায় আন্দোলনকারীদের হাতে লাঠি, রড, ইটপাটকেল। কখন কার উপর হামলা করে বসে বলা যায় না। তাই আমাদের রীতিমত ভয় করছিল কারণ সাথে মোটর সাইকেল ছিল।

আমরা বাইক নিয়ে মেইন রোড দিয়ে মৌচাকের দিকে চলতে লাগলাম। ভাইটিকে (কোনাবাড়ির আমির) বললাম আওয়ামী লীগ বিরোধী স্লোগান দিতে যেন আশপাশের জনতার সাথে মিশে নিরাপদ থাকা যায়। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি অটোতে করে গুলিবিদ্ধ আহতরা আসছে। শুনলাম শফিপুর আনসার একাডেমিতে প্রচুর গোলাগুলি হচ্ছে। সামনে এগিয়ে চলা আর নিরাপদ মনে হলো না। তাই বাইক ঘুরালাম। কিন্তু ফেরার সময় আর একই রাস্তা দিয়ে ফিরতে পারলাম না কারণ আগুন জ্বালিয়ে সে রাস্তাটি বন্ধ করে রেখেছে।

ঠিক তখনই খবর এলো নোয়াখালী যেতে হবে। খবরটা শুনেই যেন বুক থেকে একটা পাথর সরে গেল। চাপা ভার যেন নিমিষেই হালকা হয়ে গেল। কারণ কারো কাছ থেকেই কোন তথ্য পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া মাননীয় এমামের পক্ষ থেকে কোন একটা সিদ্ধান্ত যে আসবে সেটা জানতাম। কিন্তু কখন, কিভাবে, কোন অবস্থায় আসবে সেটা জানতাম না। যাইহোক এরপর বাড়ি ফিরে পরিবারকে জানালাম। প্রথমে তারা মন খারাপ করলেও পরে তারাই আবার সাহস দিল।

তারাও চাচ্ছিল আমি যেন নোয়াখালী যাই। মারা গেলে যেন কয়েকজন শত্রুকে পর্যদুস্ত করে তারপর শহীদ হই। তো সবার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এতে আশেপাশের তাগুতরা টের পেয়ে বলাবলি করছিল যে আমরা নাকি পালিয়ে যাচ্ছি। এ কথা শুনে বাড়ির মালিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। পরে আমরা তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলি যে, আমরা নোয়াখালী যাচ্ছি। কোথাও পালাচ্ছি না। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলি এখানেই আছে। তিনি আগে থেকেই আমাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ছিলেন। তাই আমাদের নিরাপদে থাকতে বলে বিদায় জানান।

অবশেষে কোনাবাড়ি থেকে ৯টি মোটরসাইকেল যোগে মোট ২০ জন নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি রাস্তায় রাস্তায় বাসের টায়ারে আগুন জ্বলছে। মেইন রোডে গিয়ে দেখি ৫ই আগস্টের আগে নতুন উদ্বোধন হওয়া রেস্তোরাঁ ও একটি ইলেকট্রনিক্স শো-রুমের কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব লুট করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক পাশে পেট্রোল পাম্প। সেখান থেকে অনেক অনুরোধ করে সাংবাদিক পরিচয়ে পেট্রোল নিয়ে নিলাম। কিছুদূর এগিয়ে অতিরিক্ত বাইকসওয়ার থাকার কারণে দুজনকে নামিয়ে দিতে হলো। পরে শুনলাম, আমরা নামিয়ে দেওয়ার এক-দুই মিনিটের মধ্যেই কিছু লোক তাদের থামিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "তোরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিস?" তবে আল্লাহর রহমতে তারা সেখান থেকে কোনরকমে রেহাই পেয়েছিল।

এদিকে আমরা অল্পসময়ের মধ্যেই গাজীপুরের নাওজোর বাইপাসে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে দেখি চারপাশে অন্ধকার, বিদ্যুৎ নেই, বাসন থানার তিনতলা ভবনটি পুড়ে ছাই। থানার সামনে রাখা গাড়িগুলোতেও আগুন। আমাদের বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করল কয়েকজন তরুণ। তারা কিছুটা উগ্র ধাঁচের। আমরা তখন বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কারণ আমরা এতগুলো বাইক নিয়ে বের হয়েছি। আবার সবার কাঁধে ব্যাগ, এমন পরিস্থিতিতে কোনো যুক্তি-তর্ক কাজে দিবে না। ঠিক এমন বিপদজনক সময়ে সেদিন আল্লাহর সাহায্য দেখলাম। তারা আমাদের তেমন কিছু না বলেই এক বাক্যে বলল, এই রাস্তা বন্ধ, গাজীপুর চৌরাস্তা হয়ে যেতে হবে আর হেডলাইট বন্ধ রাখতে হবে। আমরা কোনো তর্ক না করে বাইক ঘুরিয়ে চৌরাস্তার পথে রওনা হলাম। পথে আরেক দল আমাদের একজনের হেডলাইট জ্বালানো দেখে চিৎকার করে উঠল, "হেডলাইট বন্ধ কর!" আমি তখন সামনে ছিলাম, ভয় যেন আমাদের গলা চেপে ধরেছিল। কারণ প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঝুঁকি। যেকোনো সময় হামলা করে বসতে পারে। আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। কীভাবে এত খারাপ পরিস্থিতিতে দূরের পথ পাড়ি দিব বুঝতে পারছিলাম না। গাজীপুর থেকে বের হওয়ায় ছিল রীতিমত শ্বাসরুদ্ধকর। কিছুদূর আসার পর চৌরাস্তায় না গিয়ে ভিতরে এক লোকাল পথে ঢুকে বাইপাস হয়ে বের হলাম। বাইপাসে অপেক্ষা করছিলেন গাজীপুর মহানগরের আমির আবু রায়হান। সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলাম চিটাগাং রোড দিয়ে মদনপুর হয়ে যাব। এ পথে মানুষের আনাগোনা কম। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আল্লাহর নামে রওনা দিলাম।

রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। পথে কিছু জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখি। তবে বড় কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। মদনপুর হয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই এলাম। শুধু বাসস্ট্যান্ডগুলোতে আগুন জ্বলছিল। কুমিল্লা পার হয়ে লাকসাম আসার পথে কয়েকটি সেনাবাহিনীর গাড়ি আমাদের অতিক্রম করে। লাকসাম রেলক্রসিং পার হতেই দেখি কয়েকটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমাদের বাইক দেখে তারা সামনে এসে জানতে চাইল, আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা বললাম বাড়ি যাচ্ছি, নোয়াখালী চৌমুহনী। তারা আমাদের ফেসবুক আইডি দেখতে চাইল। আইডি দেখিয়ে বললাম, "ভাই, তাড়াতাড়ি করেন, পেছনে সেনাবাহিনীর গাড়ি আসছে।" তখন আর দেরি না করে তারা আমাদের ছেড়ে দিল। ঠিক সেই সময় আমাদের দ্বিতীয় গ্রুপের ৪ টা বাইকও এসে পড়ল। আমি বললাম, "এরাও আমাদের লোক।" তারা আর কিছু না বলে সবাইকে ছেড়ে দিল। লাকসাম বাজার পার হবার সময় দেখি বিপর্যস্ত দোকানপাট, গ্লাস ভাঙা, রাস্তায় কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বৃষ্টির কারণে কিছুটা ধোঁয়া কমেছে, তবে আগুন এখনও জ্বলছে। বিপুলাশার দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকেই দেখছিলাম রাস্তার পাশে যারা আগুন জ্বালিয়েছিল তারা বৃষ্টির কারণে মার্কেটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো আল্লাহ যেন আমাদের জন্য রাস্তা ফাঁকা করে রেখেছেন। অবশেষে রাত তিনটার দিকে পৌঁছালাম নতুন বাজার।

সেদিনের ঘটনার পর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। অনেক কিছুই স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। তবে সেদিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়লে এখনো সব জীবন্ত মনে হয়। আল্লাহর অশেষ দোয়ায় সেদিন এত বিপদের মাঝেও নিরাপদে আমরা নোয়াখালী পৌঁছাতে পেরেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

আঞ্চলিক আমির, গাজীপুর ও উত্তরা অঞ্চল।

৫ আগস্টের স্মৃতি

তারা জানতে চাইল, আমি হেযবুত তওহীদের সদস্য কি না!

আরিফ মো. আলী আহসান

২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট। দেশজুড়ে তখন চলছিল এক ভয়াবহ অরাজকতা। সরকার পতনের দাবিতে উত্তাল চারপাশ, জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক। দুপুরের পর শুনতে পেলাম প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। দেশের পরিস্থিতি তখন উত্তাল। উন্মত্ত জনতা বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, মারামারি, জ্বালাও-পোড়াও আর ভাঙচুরে ব্যস্ত। ঠিক সেই মুহূর্তে নোয়াখালীতে আমাদের প্রাণকেন্দ্র মাননীয় এমামের নিবাসস্থলেও হামলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছিল। তাই দেশের নানা প্রান্ত থেকে হেযবুত তওহীদের মো'মেন মোজাহেদরা ছুটতে শুরু করে নোয়াখালী পানে। আমিও আর দেরি না করে গোপালগঞ্জ জেলার কয়েকজন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালী অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে ছিল মোটরসাইকেল। মোটরসাইকেলে আমি আর সাথে একজন ভাই। আমরা ঠিক করলাম, শরীয়তপুর হয়ে চাঁদপুর ফেরিঘাট পার হয়ে যাব। পথিমধ্যে মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের কিছু ভাইও আমরা পেয়ে গেলাম।

মহাসড়কে জায়গায় জায়গায় ছিল আর্মি ও পুলিশের ব্যারিকেড। আবার কখনও রাজনৈতিক কর্মীদের হুমকি-ধামকি। সব পেরিয়ে যখন শরীয়তপুর ফেরিঘাটে পৌঁছালাম তখন দেখি ফেরিঘাটে কিছু বিএনপি কর্মী আমাদের ভাইদেরকে আওয়ামী লীগের কর্মী ভেবে ফেরিতে উঠতে বাধা দিচ্ছে এবং মারধরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে সময় মাদারীপুরের সবুজ কাজী ভাইয়ের কাছে সংবাদপত্রের আইডি কার্ড ছিল। উনি সেটা দেখিয়ে রক্ষা পাবার চেষ্টা করছিল। আমাকে দেখেও তারা আওয়ামী লীগের কর্মী ভেবে মারতে উদ্যত হয়। তখন রাত প্রায় বারোটা। আমিও সংবাদকর্মী পরিচয় দিয়ে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এরইমধ্যে একজন আমার মোবাইল কেড়ে নেয়। গ্যালারি ঘেটে শেখ হাসিনার ছবি দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা আমাকে টানাহেচড়া করে গাড়ি থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করে। ভয়ে তখন আমার গলা শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম! আমি শুধু মনে মনে বলছিলাম, 'হে আল্লাহ, যদি মার খেতেই হয়, তবে তা যেন নোয়াখালীতে গিয়ে খাই, রাস্তায় যেন মার না খাই'। যখন আমি তাদের বারবার বলেছিলাম যে, 'আমি সাংবাদিক', তখন তাদের একজন আমার ফেসবুক আইডি চেক করতে বলে'। এরপর তারা আমার মোবাইল নিয়ে ফেসবুক আইডিতে গিয়ে দেখে শুধু মাননীয় এমামের ছবি ও তাঁর বক্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে যায়। তারা আমার কাছে জানতে চায় আমি হেযবুত তওহীদের সদস্য কিনা? আমি বললাম, "জ্বী, আমি হেযবুত তওহীদের সদস্য।" তখন তারা বলে, 'হেযবুত তওহীদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই'। মূলত তারা মাননীয় এমামের ছবি দেখার পরই পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। তখন তারা আমাদের ছেড়ে দেয়। উল্টো ফেরিতে উঠিয়ে দিয়ে বলে, ফেরিওয়ালা যেন আমাদের থেকে ন্যায্য ভাড়া নেয়। সেদিন আল্লাহর রহমত নিজ চোখে দেখতে পেয়েছি। আমার মোটরসাইকেলের পিছনে নেমপ্লেটে গোপালগঞ্জ লেখা ছিল। সেটা যদি তারা একবার দেখত পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। এরপর আমরা শরীয়তপুর ঘাট থেকে চাঁদপুর ফেরিঘাটে সহিহ সালামতে পৌঁছাই। রাত তখন প্রায় আড়াইটা। এখানে এসেও একই ঝামেলায় পড়তে হয়। একদল সন্ত্রাসী রড-পাইপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা কৌশল করে মোটরসাইকেল সামান্য স্লো করে সংবাদকর্মী বলেই টান দিয়ে চলে আসি। যখন ফজরের আজান দেওয়ার সময় হলো তখন আমরা লক্ষ্মীপুর পার হচ্ছিলাম। পুরো রাস্তাজুড়েই ছিল গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। আমরা কোথাও না দাঁড়িয়ে সকালের আলো ফোটার আগেই মাননীয় এমামের বাড়িতে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। বৃষ্টিতে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় গর্ত আর ভাঙাচুরা রাস্তা। চোখে ছিল প্রচণ্ড ক্লান্তি আর ঘুম। পুরো রাস্তায় শুধু আল্লাহকে বার বার বলছিলাম, যেন নোয়াখালী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। অবশেষে সকালের দিকে মাননীয় এমামের বাড়িতে এসে পৌঁছাই। এখনও সেদিন রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে। তবে প্রশান্তির বিষয় হচ্ছে, যখন প্রায় মার খাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছিল ঠিক তখনই মাননীয় এমামের ছবি দেখার পর পরিস্থিতি পুরোপুরি আমাদের অনুকূলে চলে আসে। সেদিন আবারও একবার নিজের চোখে দেখেছি আল্লাহর সাহায্য কিভাবে আসে। আলহামদুলিল্লাহ।

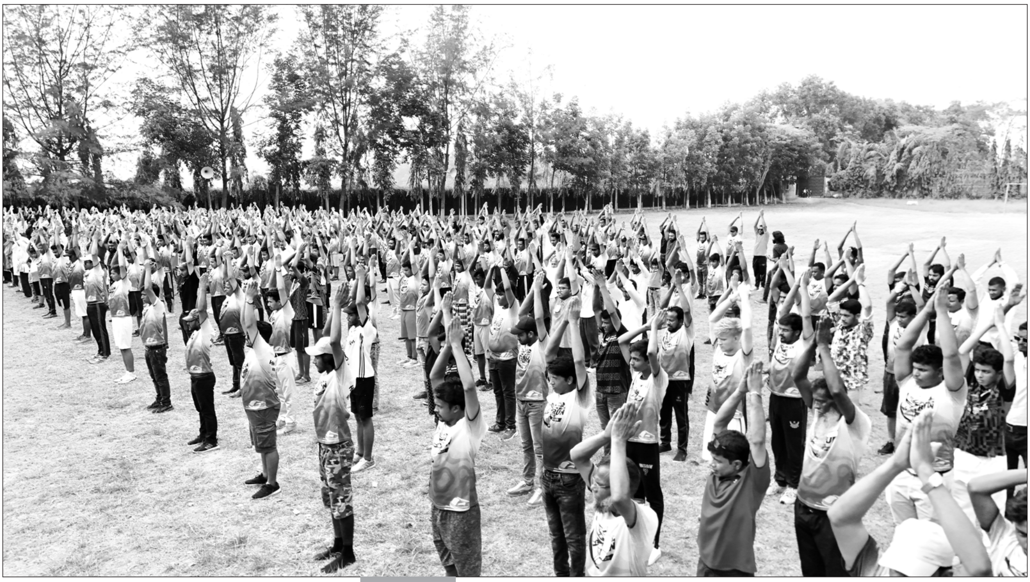

দেখা থেকে লেখা

প্রশিক্ষণ কর্মশালার দিনগুলো?

শফিউল বাদল

গত ৩ মে, ঢাকা মহানগরী হেযবুত তওহীদ এবং পিনাকল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ০৭ দিনব্যাপী একটি বিশেষ শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা মহানগর ক্রীড়া বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই কর্মশালায় ঢাকার বিভিন্ন শাখা থেকে আগত ভাই-বোনেরা অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতা ও দেশের চলমান রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সদস্যদের আত্মরক্ষা, শৃঙ্খলা, মনোবল বৃদ্ধি এবং সংকটের সময় টিকে থাকার শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শাখা থেকে আগত ভাই ও বোনেরা এবং হেযবুত তওহীদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ নির্ধারিত সময়ে ভোর ৫.৪৫ মিনিটে উত্তরা দিয়াবাড়ী মাঠে উপস্থিত হন। শরীরচর্চা প্রশিক্ষক মাহাবুবুল আলম নিক্কন স্যারের দক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। দিনের কার্যক্রম শুরু হয় বিভিন্ন প্রকার শারীরিক কসরতের মধ্য দিয়ে, যা অংশগ্রহণকারীদের শরীরকে দীর্ঘ পরিসরে প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। শারীরিক সক্ষমতা ও সহনশীলতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে "বিপ টেস্ট" -এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রথম দিন শেষ হয়। প্রতিদিনই শৃঙ্খলা এবং শারীরিক উন্নতির মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ৭ দিনের এই শারীরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলতে থাকে।

শারীরিক প্রশিক্ষণ শেষে ফ্রেশ হওয়া এবং সকালের নাস্তা শেষে ৩০ মিনিট বিশ্রামের সময় দেওয়া হয়। এরপর বেলা ১১ টা থেকে শুরু হয় থিওরিটিক্যাল বা তাত্ত্বিক ক্লাস যেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যুদ্ধের চরিত্র অর্জন, আত্মিক এবং মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সালাহ, জেহাদ, কেতাল, কর্মসূচি, দাজ্জালের ভয়াবহতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সৈনিকদের নিরাপত্তা জ্ঞান, যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য এবং সংবাদ বিশ্লেষণ কৌশল, লিডারশিপ যোগ্যতা, আত্মউন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাসহ ইত্যাদি বহুবিধ আকিদাসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়। যা আমাদের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল বজায় রাখতে জরুরি ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও আমাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া হয়। যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান, আহতদের দ্রুত উদ্ধার এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া যায়।

কর্মশালার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ ছিল স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কল্পনায় জান্নাত দর্শন। এই পর্বে উপস্থিত

সকলকে একটি নির্দিষ্ট আসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কল্পনার এক পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বপ্নের সিঁড়ি বেঁয়ে জান্নাতের সুশোভিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে সকলেই তাদের শরীর এবং মনকে কল্পলোকে অপার্থিব জান্নাতের ভিতর দিয়ে অবগাহন করেন। ফুলে ফুলে সুশোভিত বাগান পরিদর্শন শেষে বিশাল সিঁড়ি বেঁয়ে এক রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করানো হয়। ক্রমেই সবাই যেন বাস্তব দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জান্নাতের স্বর্গীয় অনুভূতির মধ্য দিয়ে বিচরণ করতে থাকে। সবাই ধীরে ধীরে কল্পনায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে থাকে। সেখানে প্রবেশের পর মহামান্য এমামুয্‌যামান এবং মাননীয় এমামের সাথে সাক্ষাৎ সবার হৃদয়চিত্তকে প্রশান্ত করে। তারপর ধীরে ধীরে সকলে তাদের চিন্তা এবং কল্পনার মিশেলে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের কোরবানির প্রত্যয় বুকে ধারণ করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পুরো মনস্তাত্তিক অভিজ্ঞতাটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হৃদয়ে এক অদ্ভুত উপলব্ধির জন্ম দেয়।

আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলাকালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে মাননীয় এমাম প্রশিক্ষণে যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার, জাতিগত আক্রোশ বা প্রতিশোধের ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করা ন্যায়সংগত নয়। এসব কারণে যুদ্ধ কখনো বৈধতা পেতে পারে না। যুদ্ধ তখনই ন্যায্য ও বৈধ বলে বিবেচিত হবে যখন কোনো নির্যাতিত জাতি বা জনগোষ্ঠী অন্যায়, নিপীড়ন ও অবিচারের শিকার হয়ে সম্মিলিতভাবে নিজেদের সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। তাদের লক্ষ্য থাকে সকল রকমের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার। এটিই মূলত দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। যেখানে যুদ্ধ একটি শেষ উপায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগমূলক পদক্ষেপ। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের নামে যে সংঘাত-সংঘর্ষ চালানো হচ্ছে এটা মহা অন্যায়। এটা ইসলামের নীতি নয়। এই সভ্যতাকে বিনাশ করে নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে হবে। এজন্যই হেযবুত তওহীদের আবির্ভাব হয়েছে।"

এই সাতদিনের কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। শারীরিক সক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপক উন্নতি তো হয়ই পাশাপাশি আন্দোলনের আকিদাগত বিষয় সম্পর্কেও ব্যাপক জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। কর্মশালার শেষ দিনে প্রথম ব্যাচের সদস্যদের স্মারক হিসেবে পিনাকল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টি-শার্ট প্রদান করা হয়। এই বিশেষ মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে মাননীয় এমামসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে একটি ফটোসেশনেরও আয়োজন করা হয় এবং আনন্দঘন পরিবেশে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রশিক্ষণে কেটেছে জড়তা

নাছিমা আক্তার

আমি অনেকদিন ধরেই সাত দিনব্যাপী শরীরচর্চার প্রশিক্ষণের কথা শুনে আসছিলাম। আমাদের হবিগঞ্জ জেলায় কবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে তা নিয়ে ভেতরে ভেতরে অনেক অপেক্ষায় থেকেছি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। ২০১৯ সালে আমি পায়ে প্রচন্ড ব্যথা পাই। এই ব্যথায় আমার পায়ের হাড় কিছুটা ফেটে যায়। তারপর থেকে শীত-গরম দুই ঋতুর শুরুতে আমি চলাফেরা করতে কষ্ট অনুভব করতাম। পা ফুলে যেত এবং হাঁটতে সমস্যা হতো। এরইমধ্যে আমাদের জেলায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে আমাদের হবিগঞ্জ জেলার ভাই-বোনেরা অংশগ্রহণ করে। আমি যখন শুনলাম যে, প্রশিক্ষণে দৌড়াতেও হবে তখন আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কারণ আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেও পারছিলাম না। কিন্তু তবুও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যাইহোক তবুও আমি কর্মশালায় অংশ নিব। যেই কথা সেই কাজ। ট্রেনিং শুরুর আগেই আমি ঢাকা চলে গেলাম পায়ের ডাক্তার দেখাতে। সেখানে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি দৌড়াতে পারবো কি না? তিনি বললেন, হ্যা পারবো তবে যথেষ্ট বিশ্রাম দিতে হবে এবং প্রতিদিন গরম পানির শেক নিতে হবে। ডাক্তার দেখানো হলে আমি আমার জেলায় ফিরে এলাম। আর এরপর সাত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলাম। আমাদের যে জায়গায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেটা ছিল আমাদের জেলা আমিরের বাড়ি। আশেপাশে গ্রামের মানুষ। তাই আমাদেরকে একটি রুমের মধ্যে শরীর চর্চা করানো হয়। প্রশিক্ষণের সময় তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল। তার উপরে একটি রুমের মধ্যে। সবার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছিল। যাতায়াতের জন্য আমরা একটি টমটম ভাড়া করে নেই এবং এই টমটমে চড়ে আমরা পাঁচজন হবিগঞ্জ থেকে শায়েস্তাগঞ্জ গিয়ে প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণের দুই দিন প্রচণ্ড ঝড়

বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমরা সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পেরেছি। আমার একটি ফোবিয়া ছিল যে গুলতি হাতে দিয়ে যদি কোন কিছু নিশানা করে মারতে চাই তাহলে ওইটা আমার হাত ভেদ করে ওখানে যাবে। অর্থাৎ আমি আহত হব। এই ভয়ে কখনো এটা আমি হাতে নেইনি। কিন্তু আমাদের ট্রেনিংয়ে সঠিকভাবে গুলতির ব্যবহার শেখানো হয় এবং আল্লাহর দয়ায় এখন এটা আমি এটি শিখেছি। এই প্রশিক্ষণের সময়গুলোতে আমার প্রতিদিনই মনে হত আমি কি পারবো শারীরিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে? দিনশেষে আমি পেরেছি। আমার অসুস্থতা, জড়তা, সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে এখন তা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি অনেককিছু শিখেছি ও অর্জন করেছি। শারীরিক সক্ষমতা ও সুস্থতা অর্জন করেছি। এরকম প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন নিয়মিত করা হোক এটাই আমার চাওয়া।

রুটিনের বাইরে সাতদিন

আমিনুল ইসলাম

আমি ব্যস্ত মানুষ। নিজের কয়েকটা ব্যবসা একা সামাল দেই। তাছাড়া প্রায় প্রতিদিনই আমার দোকানে ব্যক্তিগত বালাগ করি। তাই বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ঘুমাতে ঘুমাতেও অনেক দেরি। যার ফলে আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। এরইমধ্যে জানতে পারলাম শায়েস্তাগঞ্জে সাত দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সবকিছু গুছিয়ে সাতদিনের কর্মশালায় কিভাবে অংশ নিব তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বারবার তাগাদা দিলেন যেন আমি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। যাইহোক এরপর আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হই। আমি হবিগঞ্জ থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। আমরা প্রশিক্ষণের সাতদিন খুব ভোরে অর্থাৎ ৪টার দিকে ঘুম থেকে উঠে যেতাম। নির্ধারিত সময়ে ঘুম থেকে উঠা এবং শরীরচর্চার জন্য তৈরি হওয়া ছিল আমাদের সবার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এত সকালে গাড়ি পাওয়াও এত সহজ ছিল না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আগে থেকেই সিএনজি ভাড়া করে নিব। এরপর প্রতিদিন আমরা সিএনজি রিজার্ভ করে শায়েস্তাগঞ্জ প্রশিক্ষণ দিতে যেতাম। তবে একদিন আমাদের সিএনজি রাস্তায় নষ্ট হয়ে গেল। তখন আমরা দ্রুত মোটরসাইকেল ব্যবস্থা করে সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণস্থলে পৌঁছাই। সেখানে শৃঙ্খলার ব্যাপারে কোন আপোস ছিল না। সময়ের একমিনিটও এদিক-ওদিক করার সুযোগ নেই। এটি আমাদের নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছে। এই প্রশিক্ষণের দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবে শারীরিক ও মানসিক অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছি। আমাদের প্রশিক্ষকদের কথা না বললেই নয়। তাদের দেখলেই মনে হয় হত তারা আমাদের শিক্ষক। তাদের কথাবার্তা, নিয়মানুবর্তিতা সত্যিই অনন্য। প্রশিক্ষণের শেষের দিন যখন আমাদের ভাবানুভূতি প্রকাশ করতে বলা হয় তখন অনেকেই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। আন্দোলনের এত বছরেও দীর্ঘ সময় আমাদের এভাবে একত্রিত থাকা হয় নি। কিন্তু প্রশিক্ষণের এই দিনগুলোতে এত মানুষকে একসাথে পেয়ে আমরা আমাদের আবেগ ধরে রাখতে পারিনি। সেদিন অনেকের কথায় যেমন আমরা হেসেছি অনেকের কথায় কেঁদেছি। প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষের দিনে সকল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা আত্মার টান অনুভব করেছি। আমি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

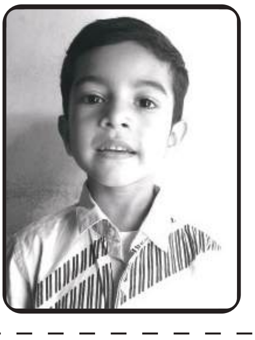

শুভ জন্মদিন

নাম : মো. মাহাদি হাসান

পিতা : শফি আল বাশার

জন্ম তারিখ : ১৭ জুলাই ২০২০

মাতা: জান্নাতুল মরিয়ম

আখবারে তওহীদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায় সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

গোড়াইয়ের প্রত্যাদেশ "সামনেই বিজয়"- বললেন এমামুয্‌যামান

কাজী আবদুল হক

আমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। ২০১৭ সালে আমি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে যোগদান করি। মাননীয় এমামের নির্দেশক্রমে ২০২১ সাল থেকে হেযবুত তওহীদের ভারত শাখার দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমি মহামান্য এমামুয্‌যামানের দেওয়া এই মহাসত্য অনুভব করে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে যোগদান করি। কিন্তু মহামান্য এমামুয্‌যামানের সাথে আমার স্বশরীরে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয় নি। এটা নিয়ে আমার ভিতরে একটা মনোঃকষ্ট থাকলেও আমি সর্বদা তাঁকে আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এ বছর আল্লাহ পাক পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আমাকে আমাদের প্রিয় নেতা, মাননীয় এমামের পেছনে আদায় করার সৌভাগ্য দান করেছেন। এ জন্য আমি আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

গত ৮ এপ্রিল সকালে ঢাকা থেকে বড় আপা ও মসিহ আমিরের সঙ্গে টাঙ্গাইল যাওয়ার পথে গোড়াইয়ে মহামানী এমামুয্‌যামানের মাজার জিয়ারতের সৌভাগ্য আমার হয়। যদিও এর আগেও একবার জিয়ারতের সুযোগ হয়েছিল। আমি ও বড় আপা গোড়াইয়ে পৌঁছে ধীরে ধীরে মাজারে অভিমুখে প্রবেশ করছিলাম। আমরা মাজারে প্রবেশ করে মহামান্য এমামুয্‌যামানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে সুরা ফাতিহা ৭ বার, সুরা ইখলাস ৯ বার ও দরুদ শরীফ ১১ বার পাঠ করি। তারপর একনিষ্ঠভাবে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। কিছু মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পেলাম, মাননীয় এমামুয্‌যামান হাসছেন আর আমাকে বলছেন: "আর বেশি সময় নেই, কাজ চালিয়ে যান, কাজ চালিয়ে যান।" (সম্ভবত দুই বা তিনবার বলেছেন, তবে দুইবার তো নিশ্চিতভাবে বলেছেন) তিনি আরও বললেন: "সামনেই আমাদের বিজয়।" এরপর ঘুম ভাঙার মতো করে আমি চোখ খুলে দেখি, আমি এখনো মাজারের পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার শরীরে যেন এক ধরনের কম্পন শুরু হলো। নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একটু বাতাসে উড়ে যাব। সেই মুহূর্তে আমার হৃদয়ে যে বিপুল আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমন আনন্দে, এমন সুখে যদি আমি বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম!

তারপর আমি একটি গাছ থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে এনে মাননীয় এমামুয্‌যামানের পায়ের কাছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে রেখে দিই। সে সময় আমার দুই চোখ দিয়ে যে পরিমাণ আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল, তা বোঝাতে আমি অক্ষম। আজও সেই স্মৃতি মনে হলে শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে চোখে অশ্রু এসে পড়ে।

কুইজ

- ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম নারী কে এবং প্রথম নারী শহীদ কে?
- কোরআনে পর্দার আয়াত কোনগুলো?
- উম্মতে মোহাম্মদীর তিনজন নারী যোদ্ধার নাম উল্লেখ করুন।
- নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণের দুইটি ঘটনা উল্লেখ করুন।
- মদিনার মসজিদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন কোন নারী?

যেভাবে চলছে অনলাইন বালাগ প্রশিক্ষণ

সুলতানা রাজিয়া হেলেন

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আন্দোলনের আদর্শকে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের কাছে প্রচার করা, অর্থাৎ বালাগ করা। কেতাল পর্ব আসার আগ পর্যন্ত এটাই আমাদের জেহাদ। আন্দোলনের শুরু থেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের জন্য কাজ করা হয়েছে, যেমন- পথ সভা, র‍্যালি, জনসভা, মাইক বালাগ, পত্রিকা বালাগ, সভা সেমিনার ইত্যাদি।

এরপর ২০০৯ সালে আন্দোলনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়, সেটা হচ্ছে অনলাইন বালাগ। প্রথম দিকে অল্প পরিসরে এ বালাগ শুরু হলেও বর্তমানে এর ব্যাপকতা অনেক। অনলাইন বালাগের ফলে আন্দোলনের প্রচারের দুটো শাখা তৈরি হলো- অনলাইন এবং অফলাইন বালাগ। অনলাইন বালাগ এমন একটি যুগান্তকারী মাধ্যম যে মাধ্যমে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অল্প পরিশ্রমে, স্বল্প খরচে অনেক বেশি মানুষের কাছে বালাগ পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে সময়েরও কোনো লিমিটেশন নাই, ২৪ ঘন্টা চলে এ বালাগ। তাছাড়া পরিচিত, অপরিচিত, ভিআইপি, সাধারণ মানুষ সবার কাছে সহজেই পৌঁছানো যায়। দেশের সীমানা পেরিয়ে এ বালাগ পৌঁছে যায় দূরদেশে। এক্ষেত্রে কোনো প্রোটোকল মেইনটেইন করার প্রয়োজনও হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, মানুষ সরাসরি মাননীয় এমামের কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে পারে। বর্তমানে হেযবুত তওহীদ যতটা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে, তার সিংহভাগই হয়েছে অনলাইন বালাগের ফলে। বর্তমান সময়ে এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে না এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। আর এদের প্রায় সবাই ফেসবুকে আছে, ইউটিউবে আছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও হেযবুত তওহীদ প্রবেশ করেছে অনলাইন বালাগের অবদানে। মাননীয় এমাম বর্তমানে অনলাইন বালাগে অনেক বেশি জোর দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, কারো পেটে খাবার না থাকলেও তার একটা ফোন থাকবে, কারণ ফোনটা হচ্ছে অনলাইন বালাগের জন্য একটা অস্ত্র। যোদ্ধার পেটে খাবার না থাকলেও অস্ত্র থাকা লাগে। রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর আসহাবগণের জীবনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের ভাই-বোনরা মাশাল্লাহ অনলাইন বালাগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক কিন্তু যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং বালাগের নিয়মকানুন না জানার কারণে অনেক সময় কিছু ভাই-বোন ছোট-বড় ভুল করে ফেলেন। এ কারণে অনলাইন বালাগকে আরও বেশি কার্যকরী করতে, আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে আমরা অনলাইন প্রচার বিভাগ মাননীয় এমামের দিকনির্দেশনা ও চাওয়া অনুযায়ী দেশব্যাপী অনলাইন বালাগকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। কেন্দ্র থেকে ১১ জনের একটা টিমকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই টিমের মেম্বারদের কাজ হচ্ছে- তারা প্রতিটা বিভাগে যাবে, প্রতিটা জেলাতে অবস্থান করে প্রত্যেক বালাগকারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনবে, অনলাইন বালাগে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে অনলাইন বালাগের

গতি বৃদ্ধি পাবে এবং ভাই-বোনদের ভুল করার প্রবণতা অনেকাংশেই কমে আসবে ইনশাল্লাহ। জুন, ২০২৫ থেকে এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, রংপুর বিভাগ, সিলেট বিভাগে প্রশিক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেছি। এছাড়া ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে বেশ কয়েকটা প্রশিক্ষণ দিয়েছি। শীঘ্রই ময়মনসিংহ বিভাগেও প্রশিক্ষণ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল:

প্রশিক্ষকদের সাথে কথা বলে আমি যেটুকু তথ্য পেয়েছি তাতে প্রশিক্ষণগুলো মাশাল্লাহ খুব প্রাণবন্ত হচ্ছে, খুব কার্যকরী প্রশিক্ষণ হচ্ছে। প্রশিক্ষকগণ হাতে-কলমে সবাইকে বালাগের সঠিক নিয়ম-কানুন ও করণীয় এবং বর্জনীয় দিকগুলো শেখাচ্ছেন। আর আমাদের সদস্যরাও খুব আনন্দের সাথে, উৎসাহের সাথে এটা গ্রহণ করছেন এবং বলছেন, “এমন প্রশিক্ষণ তাদের দরকার ছিল।” প্রশিক্ষণের ফলে তারা ভুলভ্রান্তি শুধরানোর সুযোগ পাচ্ছে। এখন থেকে নিয়মিত কাজ করবেন এমন আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন তারা।

আমিরদের সহযোগিতা:

প্রশিক্ষণ আয়োজন নিয়ে আমরা আমিরদের যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে কখন কী দরকার, কোথায় সমস্যা হচ্ছে এ বিষয়গুলোতে সিলেট, রংপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল বিভাগের আমিরদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না। আশা করি বাকি বিভাগগুলোতেও সমান সহযোগিতা পাব।

প্রতিবন্ধকতা:

কিছু শাখায় দেখা গেছে প্রশিক্ষণে সময়মতো সদস্যরা আসে নি, আবার প্রশিক্ষণে আসলেও একটা সংখ্যা বলেছে তাদের হাতে সময় নাই, একটা সংখ্যা বলেছে এটা যে প্রশিক্ষণ তা তারা জানত না তাই ২-৩ ঘণ্টা ধরে প্রশিক্ষণ নেয়ার মতো প্রস্তুতি তাদের হাতে নাই ইত্যাদি। এমনটা ঘটেছে খুব কম ক্ষেত্রে, কয়েকটা জায়গায়। আশা করি আমিরগণ এ জায়গায় আরেকটু আন্তরিকতা দেখাবেন।

যে কারণে বাকি বিভাগগুলোতে প্রশিক্ষণ শেষ করা যাচ্ছে না:

আমিরদের বারবার বলার পরও সিডিউল দিচ্ছেন না, কোনো আমির বিভিন্ন সমস্যা দেখাচ্ছেন বলে সামনে এগুতে পারছি না। আমিরদের কাছে অনুরোধ, শাখার কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণ থামিয়ে রাখবেন না। চলমান অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এ কাজটাও সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিবেন। আপনারা যে কাজই করছেন সব কাজের উদ্দেশ্য কিন্তু এক, আন্দোলনের প্রচার। তাই এ প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সাথে নিন। কোনো ঘটা করে মিটিং আয়োজনের দরকার আমাদের নেই, ৮-১০ জন করে ঘরোয়া পরিবেশে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে দিন, আমাদের প্রশিক্ষকরা গ্রামীণফোন নেটওয়ার্কের মতো সবখানে পৌঁছে যাবেন ইনশাআল্লাহ। মাননীয় এমামের একটা চাওয়া হচ্ছে ৫০০০ আইডি, অর্থাৎ আমাদের ৫০০০ বালাগকারী লাগবে যাদের ৫০০০টি ডিভাইস থাকবে। মাননীয় এমামের কোনো লাইভ হলে ৫০০০ মানুষ একসাথে লাইভটা দেখবে, একটা ঝড় উঠে যাবে। যার হাতে একটা ফোন আছে সে যেন অন্তত অনলাইনে ন্যূনতম কাজটুকু করে, এটা নিশ্চিত করাটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বাস্তবতা হলো এখন পর্যন্ত আমাদের প্রকৃত বালাগকারীর সংখ্যা ২০০০ এর নিচে। এ সংখ্যাকে ৫০০০ এ উন্নীত করতে হলে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। সম্প্রতি বিভাগীয় আমিরদের কাছে একটা নির্দেশনা গেছে- শাখায় কোনো জয়েনিং প্রোগ্রাম হলে আমিরগণ সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্রচার সম্পাদককে প্রোগ্রামে রাখবেন। সম্পাদক সরাসরি নতুন সদস্যদের সাথে কথা বলবেন। তাদের মধ্যে এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের ফোন নাম্বার, ফেসবুক আইডি নিবেন। তাদের অনলাইন বালাগের আকিদা বুঝিয়ে বালাগের প্রাথমিক কাজে যুক্ত করে নিবেন। আশা করি আমিরগণ বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে নিবেন।

এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা:

আমরা চাই আগামী একমাসের মধ্যে প্রত্যেক অনলাইন বালাগকারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে। শতাধিক ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনলাইনে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে। কেন্দ্রীয় কয়েকটা পেইজ বাদে বর্তমানে আমাদের জেলা ও বিভাগীয় পেইজ ৭২টি। এগুলোতে নিয়মিত তদারকি করে পোস্ট করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অনেক পেইজে ভালো রিচ পাওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া আমরা ৫০ টা ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেগুলো নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি, খুব শীঘ্রই এ জার্নিও শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের আরেকটা উদ্যোগ হচ্ছে, আমাদের পেইজ এবং চ্যানেলের পোস্টগুলোতে পজিটিভ কমেন্ট করানো, রিপ্লাই করানো। এর ফলে বাইরের মানুষ পোস্টে এসে পজিটিভ বার্তা পাবে। বর্তমানে ৩০+ সদস্য নিয়মিত স্পেশাল রিপ্লাই টিমের আন্ডারেব এ কাজ করে আসছে। এ বছরের মধ্যে এ সংখ্যাকে অন্তত ২০০ তে উন্নীত করার টার্গেট আছে। এছাড়া আমাদের একটা লেখক টিম আছে। এ টিমের ১০-১২ জন সদস্য নিয়মিত লেখালেখি করেন। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে, বছর শেষে এ সংখ্যাকে অন্তত ৫০ এ নিয়ে আসা। আমাদের এ যাত্রায় মাননীয় এমামের দোয়া চাই, সম্মানিত আমিরগণসহ সকল মোজাহেদ-মোজাহেদার দোয়া চাই।

মানতের ফল

আশ্চর্যজনকভাবে দোকান ভাড়া হল

আমি মো. হাবিবুর রহমান, কেরানীগঞ্জ থানা আমির। দুই-তিন মাস আগে আমি আমার একটি দোকান ভাড়া দিতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছিলাম। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও দোকানটি ভাড়া হচ্ছিল না। এমনকি প্রায় ১৮ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েও দোকানটি ভাড়া হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন আসরের সালাতের পর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম মানত করলে হয়ত দোকানটি এত দিনে ভাড়া হয়ে যেত। কারণ এর আগেও বহুবার আমি মানতের সুফল পেয়েছি। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যদি দোকানটি ভাড়া হয় তবে এক হাজার টাকা মানত ফান্ডে দান করব। সেদিন মাগরিবের সালাত আদায় করে যখন দোকানে ফিরলাম আচমকা এক ব্যক্তি এসে দোকান না দেখেই ১০ হাজার টাকা এডভান্স দিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই, আপনি দোকান দেখবেন না?" তিনি বললেন, "দোকান দেখার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু এডভান্সের টাকাটা রাখেন।" তিনি কোনো কাগজপত্র ছাড়াই টাকা দিয়ে গেলেন এবং ১৫ দিন পর এসে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদন করে দোকানটি ভাড়া নিলেন। এই ঘটনার মাধ্যমে আমি ফের উপলব্ধি করলাম আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করলে বা মানত করলে পরম দয়ালু স্রষ্টা সাহায্য পাঠাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেন না। কিন্তু আমরা অনেকেই তা অনুভব করতে পারি না। যারা আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন তারা বার বারই এমন অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হন।

এমামুযযামানের উসিলায় অবশ পা সচল

আমি সেলিনা আক্তার, সাভার শাখার একজন মোজাহেদা। ঘটনাটি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনের সময়কার। ম্যারাথন শেষে বাসায় ফেরার পথে আমার দুটো পা অবশ হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে যায়, যে আমি দুইজনের সাহায্য ছাড়া এক কদম চলতে পারছিলাম না। দুই বোনের সহায়তায় আমি অটোতে করে কোনোভাবে বাড়ি ফিরি। এরপর টানা ২০ দিন এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি থেকে শুরু করে সব ধরনের চিকিৎসা নেই। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই কাজ হচ্ছিল না। আমি কার্যত অচল হয়ে পড়ি। আমার স্বামীর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই করতে পারতাম না। এমনকি নিজে নিজে হাঁটতেও পারতাম না। এ সময় একদিন আমাদের আমির জানালেন, গোড়াইতে মহামান্য এমামুয্যামানের মাজার জিয়ারতের জন্য সবাইকে যেতে হবে। কথাটি শুনে আমার অন্তরে এক আশা জেগে উঠে। মনে মনে ভাবি যদি এমামুয্যামানের কবর জিয়ারত করি তাহলে হয়ত মানসিকভাবে কিছুটা প্রশান্তি পাব আর আল্লাহ চাইলে সুস্থতাও দান করতে পারেন। আমি আমার স্বামীকে অনুরোধ করি আমাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য। আমার আকুলতা দেখে তিনি আমাকে নিতে রাজি হন। আমার স্বামী ও বোনদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি গোড়াইতে গিয়ে পৌঁছাই। যাওয়ার পথেই আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন আমি আবার আগের মত সুস্থ হয়ে দীনের কাজ করতে পারি। আমি বিগলিত মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং মানত করি। এরপর এমামুয্যামানের কবর জিয়ারত করার জন্য আমার সিরিয়াল আসে। আমি আমার স্বামী ও বোনদের সহায়তায় এমামুযযামানের কবর জিয়ারত করি এবং আল্লাহকে স্মরণ করে অনেক কান্নাকাটি করি। তার নিকট আমি সাহায্য চাই এবং নিজের মনের সব কষ্ট খুলে বলি। কবর জিয়ারত শেষে আমরা বাড়ির পথে রওনা হই। ফিরে আসার পথে মানসিকভাবে কিছুটা ভালো লাগলেও শারীরিকভাবে তখনও তেমন উন্নতি হয়নি। যাইহোক, আমরা নিরাপদে বাসায় পৌঁছাই। বাসায় ফেরার পর পায়ের অবস্থা কিছুটা ভালো অনুভব করছিলাম, পায়ে সামান্য ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম, কিছুটা হাঁটতেও পারছিলাম। এরপর আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে বিছানা থেকে নামতেই আমি বিস্মিত হয়ে যাই। এ কী আশ্চর্য! আমার পা দুটো সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে গেছে! আমি নিজে নিজেই হাঁটতে পারছি ঠিক আগেরই মত। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি আমার স্বামীকে ডেকে বলি আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি। তিনিও বিস্মিত হয়ে যান যে এটা কীভাবে সম্ভব! পরে আমরা বুঝতে পারি যে এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। মহান আল্লাহ আমার আকুল প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দার উসিলায় আমাকে সুস্থতা দান করেছেন। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এক অনন্য উপলব্ধি হয়ে থাকবে। আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠচিত্তে কোন প্রার্থনা ও মানত করলে তা কখনোই বিফলে যায় না।

অলৌকিক ঘটনা

নেটওয়ার্কবিহীন রুমে নির্বিঘ্নে চলল কনফারেন্স

আমি রাফিয়া নৌশিন এমিলি, জামালপুর জেলার দপ্তর সম্পাদক। মাননীয় এমাম ২০২৫ সালকে বিজয়ের বছর ঘোষণা করায় এ বছরের মোজেজা দিবসটি (২ ফেব্রুয়ারি) আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করার নির্দেশনা আসে। বলা হয়, সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ সন্ধ্যা ৭টা বাজে মাননীয় এমাম জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। কনফারেন্স পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার উপর। যদিও আমাদের জেলা অফিসে দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না। তাই জেলা আমিরের ফোন থেকে হটস্পটে ইন্টারনেট নিয়ে কনফারেন্স চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হটস্পট কানেক্ট করার সময় দেখি ফোনে চার্জ আছে মাত্র ৩০-৩৫% যা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। চার্জ দেওয়ার সুযোগও ছিল না। তবুও কনফারেন্স কানেক্ট করে একজনকে মোবাইল দেখার দায়িত্ব দিয়ে আমি পাশের রুমে যাই। কিছুক্ষণ পর ফোনের চার্জ চেক করতে আমি আবার ফিরে আসি। এসে দেখি ফোনে এখনো ১০% চার্জ আছে কিন্তু হটস্পট ও ডেটা বন্ধ। কিভাবে বন্ধ হলো কেউ জানে না। আমি পুনরায় রুমে ফিরে দেখি সবাই নির্বিঘ্নে কনফারেন্স শুনছে। কোন টেকনিক্যাল বা ইন্টারনেট সমস্যা ছাড়াই পুরো অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরে ফোন হাতে নিয়ে দেখি দশটিরও বেশি কল এসেছিল, তবু নেটওয়ার্ক একবারও বিচ্ছিন্ন হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য ছিল। এরপর ঘটনাটি জেলা আমিরকে জানালে তিনি মুচকি হাসেন।

বি.দ্র.: এখনো জেলা অফিসের সেই রুমে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায় না।

ঘন জঙ্গলে পথ দেখাল কুকুর

আমি মো. রোকনুজ্জামান, টাঙ্গাইলের গোড়াই শাখার মোজাহেদ। সম্প্রতি আমরা গোড়াইয়ে এমামুযযামানের মাজারের পেছনে এক রুমের একটি বাসা ভাড়া নিয়ে আছি। একদিন আমি ও আমার স্ত্রী জেসমিন আক্তার রিজিকের জন্য দেওহাটা থেকে ভিতরের দিকে একটি বাজারে যাই। ফেরার সময় আমরা পথ ভুলে নতুন একটি রাস্তায় চলে আসি। ফলে বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে মূল সড়কে উঠব। এমন সময় সামনে থাকা এক বৃদ্ধ লোককে মেইন রোডে যাওয়ার পথ জিজ্ঞাসা করি। তিনি সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে বলেন, এই রাস্তার সোজা যান, ব্রীজের নিচ দিয়ে একটি পথ পাবেন, সেটা ধরে গেলেই দেওহাটা। আমরা বাইকে ছিলাম কিন্তু লোকটি যে রাস্তা দেখালেন সেটা ছিল আসলে হাঁটার পথ। তারপরও সাহস করে আমরা দুইজন আগাতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি দুই পাশে বাঁশঝাড়ে ঘেরা ঘন জঙ্গল। চারদিকে শুনশান, থমথমে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা দুজনেই বিপদ-আপদের ভয় পাচ্ছিলাম। তখন মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলাম। ঠিক তখনই ঘটে একটি আশ্চর্য ঘটনা। দেখলাম দূর থেকে আলো আসছে। মনে হলো কেউ বাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মুহূর্তেই সেটা কুকুর হয়ে বাইকের সামনে সামনে দৌড়াতে শুরু করল। ঠিক যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভয় কিছুটা কমে গেল। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ পথ ধরে সে আমাদের সামনে সামনে চলছে। যেখানে যেখানে মোড় ছিল সেখানে সেখানে কুকুরটি থেমে আগে গিয়ে বুঝিয়ে দেয় কোনটা সঠিক পথ। এভাবে আমরা সেদিন কুকুরটির সহায়তায় নিরাপদে মূল রাস্তায় পৌঁছাতে সক্ষম হই। মেইন রোডে উঠার পর পরই কুকুরটি উধাও হয়ে যায়। এরপর আর কুকুরটিকে দেখতে পাই নি। সেই ঘটনার পর আমি বুঝতে পারি যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য ছিল।

এমামের দোয়া অতঃপর সুস্থতা

আমি মুস্তাফিজ সোহাইল। বর্তমানে মতিঝিল শাখার মোজাহেদ। আমি ২০২১ সাল থেকে নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করিয়েছি কিন্তু আমার কোন সমস্যা ধরা পড়ে নাই। এমন কি বড় আপার কাছ থেকে ওষুধ খেয়েও সুস্থ হতে পারি নাই। এই শারীরিক

সমস্যা নিয়েই আমি দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলনের কাজ করে যাচ্ছি। এরইমধ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রব্যবস্থা বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর মাননীয় এমাম আমার জন্য দোয়া করে আমাকে একটি বই উপহার দেন। বইয়ের পাতায় এমাম লিখে দেন যে, আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থতা দান করেন। আশ্চর্যজনকভাবে মাননীয় এমামের এই দোয়ার পর থেকে আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। মনে হচ্ছে ১৫ বছর আগে আমার শারীরিক সক্ষমতা যেমন ছিল তেমন হয়ে গেছে। আল্লাহর শোকর আদায় করার ভাষা আমার জানা নেই। মাননীয় এমামের দোয়ায় আমি আমার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমার সারাজীবন মনে থাকবে।

পরবর্তীতে মাননীয় এমামকে যখন জানানো হয় বিষয়টি তখন মাননীয় এমাম বলেন, "আমার কাছ থেকে নতুন বই এ পর্যন্ত যারাই নিয়েছেন আমি একেক জনকে একেকভাবে লিখে দিয়েছি। কিন্তু সোহাইলের বেলায় আমি কেন লিখলাম যে আল্লাহ যেন তাকে সুস্থতা দান করেন! কেন লিখলাম আমি বুঝলাম না! আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেকের নিয়ত ও ভক্তির উপর বরকত দান করেন সেটাই এই ঘটনায় প্রমাণিত।"

আকীদাহীন জেদের পরিণতি ও শিক্ষা

গাজীপুর প্রতিনিধি: গত ২৫ জুলাই ২০২৫ গাজীপুরে মাননীয় এমামের নতুনদের জয়েনিং প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীপুর থানার মাওনা থেকে ছয় গাড়ি নতুন লোক নিয়ে আসার কথা ছিল। দায়িত্বশীলদের প্রতি নির্দেশনা ছিল জুমার নামাজের আগেই সবাইকে নিয়ে বাস রওনা হবে এবং পথের মাঝে যেকোনো মসজিদে জুমার নামাজ করিয়ে নিবে। তাতে প্রোগ্রামস্থলে নির্দিষ্ট সময়ে সবাই পৌঁছাতে পারবে। ছয়টি গাড়ির মধ্যে পাঁচটি ঠিকমত পৌঁছাতে পারলেও ছয় নং গাড়ির এক দাওয়াতি মেহমান ও দাড়িওয়ালা ড্রাইভার জেদ করে বসে যে জুমার নামাজ না পড়ে তারা রওনা দিবেনা এবং তারা সেটাই করে। জুমার নামাজ পড়েই তারা গাড়ি নিয়ে রওনা হয় এবং গাড়িটা অর্ধেক রাস্তা আসার পর পথে আরেক গাড়ির পেছনে গিয়ে স্বজোরে ধাক্কা মারে। এতে ড্রাইভার দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেলেও জেদ করা অপর মেহমানটি মারাত্মকভাবে আহত-রক্তাক্ত হয়। তার সাথে আরো দুজনও আহত হয় কিন্তু তারা তুলনামূলক অনেক কম। পরে তাদের দ্রুত গাজীপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে বাকি দুইজনকে চিকিৎসা দিয়ে ডাক্তার ছেড়ে দিলেও জেদ করা মেহমানের অবস্থা সিরিয়াস হওয়ায় তাকে আবারও হাসপাতালে যেতে বলে। এই ঘটনায় আমার উপলব্ধি হয় যে, আল্লাহ আমাদের সর্বদা অগণিত সাহায্য করে থাকেন। তার কিছু আমাদের দৃশ্যমান হয় আর কিছু অদৃশ্যই থেকে যায়। এক্সিডেন্ট করা গাড়িটা যদি আমিরের নির্দেশমত অন্যান্য গাড়ির সাথে ঠিকসময় রওনা দিত তাহলে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। আর বাকি গাড়িগুলোর মত তারাও নিরাপদে প্রোগ্রামে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু তার এই আকিদাবিহীন নামাজের জেদের কারণে তার প্রোগ্রামও দেখা হলো না। পাশাপাশি সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

বালাগে বাধা

মুন্সীগঞ্জে মব সৃষ্টি করে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের হয়রানি!

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মব সৃষ্টি করে হেযবুত তওহীদের ১০ সদস্য ও ৪ শুভাকাঙ্ক্ষীকে স্থানীয় কালকারখানার চাকরি থেকে বাদ দিতে বাধ্য করে স্থানীয় জামায়াতে ইসলাম, হেফাজত-চরমোনাইসহ একটি ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী। গত ৩০ জুলাই ২০২৫, বুধবার গজারিয়া থানার হোসেনদী ইকোনমিক জোনে ঢাকা সুগার লিমিটেড চিনি কারখানা থেকে তাদেরকে জোরপূর্বক অব্যাহতি দেয়া হয়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৭ জুলাই মুন্সীগঞ্জ জেলা হেফাজতে ইসলামের সেক্রেটারি মাওলানা হুসাইন আহমাদ ইসহাকীর নেতৃত্বে জামায়াত-হেফাজত ও চরমোনাইয়ের ৫০/৬০ জন নেতাকর্মী ওই কারখানার বাইরে অবস্থান নেয়। তারা কারখানায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীরা

গেট আটকে দেন। এসময় তারা হেযবুত তওহীদের সদস্যদের কারখানা থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানায় অন্যথায় কারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করার হুমকি দিতে থাকে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ ভয়ে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। চাকরিচ্যুত হেযবুত তওহীদের সদস্য মেহেদী হাসান ফারুক বলেন, হেযবুত তওহীদ একটি বৈধ সংগঠন। আমরা এই কারখানার কয়েকজন কর্মী এই আন্দোলনের সাথে বহু বছর ধরে আছি। দেশের নাগরিক হিসেবে যে কোনো বৈধ সংগঠন করার এবং মতাদর্শ প্রচার করার অধিকার আমাদের রয়েছে।

সখিপুরে পত্রিকা বিক্রিতে বাধা ও হুমকি

গত ৯ জুন ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগ চলাকালে টাঙ্গাইলের সখিপুরে হেযবুত তওহীদের চারজন সদস্যকে বাধা ও হুমকি প্রদান করা হয়। জানা যায়, সখিপুর পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ গেটসংলগ্ন সাদিয়া এন্টারপ্রাইজ দোকানের সামনে পৌঁছালে, দোকানমালিক ও তার সহযোগী কিছু উগ্রপন্থী আমাদের সদস্যদের বাধা দেন এবং জনসমক্ষে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ ও ভুয়া দাবি করে মোজাহেদা তাসলিমা আক্তার, নাছিমা বেগমকে হেনস্তার চেষ্টা করে। তাদের সাথে ছিল অন্য দুই মোজাহেদ রুবেল খান ও রনি মিয়া। বিষয়টি উপজেলা আমিরকে অবহিত করা হলে, তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুইজন প্রতিনিধি রেখে বাকিদের নিরাপদে সখিপুর জেলখানা মোড়ে পাঠিয়ে দেন। এরইমধ্যে ঘটনাস্থলে আরও উগ্রপন্থীরা জড় হতে থাকে এবং জেলখানা মোড়েও হুমকিদাতারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে। তখন টাঙ্গাইল জেলা আমির তার নতুন প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডি করে মোজাহেদরা নিরাপদে সখিপুর ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হেযবুত তওহীদের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

পাকুন্দিয়ায় পত্রিকা পুড়ালো জামায়াতপন্থীরা

গত ৮ জুন, রবিবার সকাল ১১টা ৩৮ মিনিটে ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগ চলাকালে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোলা রোডে ন্যাশনাল ব্যাংকের পাশে হামলার শিকার হন হেযবুত তওহীদের সদর উপজেলা সভাপতি মো. সামিউল হাসান আরফান। জানা যায়, পত্রিকা বিতরণকালে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর পৌর শাখার সেক্রেটারি মো. মুজাহিদুল ইসলাম ও জালাল মো. গাউস (শাওন)-এর নেতৃত্বে ৭-৮ জন সন্ত্রাসী তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে তাকে মারধর করে। এসময় উপজেলা সভাপতি মো. সামিউল হাসান তাদেরকে বলেন যে, "এটি সরকার অনুমোদিত পত্রিকা, পত্রিকা বিক্রিতে কোনো আইনগত বাধা নেই। সমস্যা থাকলে থানায় চলুন।" কিন্তু উত্তরে এক হামলাকারী অপমানজনক ভাষায় বলে, "থানার বাপকে এখানে নিয়ে আয়।" এরপর তারা তার হাত থেকে ৫০ কপি পত্রিকা ছিনিয়ে নিয়ে জনসমক্ষে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাকে জিম্মি করে রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে পাকুন্দিয়া বাজারে পত্রিকা বিক্রি করলে হাত-পায়ের রগ কেটে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। অবশেষে তিনি নিজেকে মুক্ত করে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

খিলক্ষেতে পত্রিকা ছিনিয়ে নিল ধর্মব্যবসায়ী

ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগ চলাকালে বাধার শিকার হন হেযবুত তওহীদের গুলশান শাখার মোজাহেদ মাসুদ সরকার এবং শরীফ। জানা যায়, ঘটনার দিন খিলক্ষেত জামে মসজিদের সামনে পৌঁছালে ধর্মীয় বেশধারী দুইজন বয়স্ক ব্যক্তি হঠাৎ করে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক এবং বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতে থাকে। তখন মাসুদ সরকার তাদের উদ্দেশে বলেন, এই পত্রিকাটি একটি আদর্শিক পত্রিকা, যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ইসলামের বাণী মানুষের কাছে তুলে ধরছি। কিন্তু

তারা কোনো কথা না শুনে একপর্যায়ে মসজিদের এক ইমাম এসে মাসুদের হাত থেকে পত্রিকাটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। মাসুদ পত্রিকা ফেরত চাইলে তারা বলেন, "পত্রিকা ফেরত দেওয়া হবে না, যা পারেন করেন।" পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় সংশ্লিষ্ট থানা আমিরকে তাৎক্ষণিক অবহিত করা হয় এবং থানায়ও জানানো হয়। এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিরোধিতা করতে গিয়ে জনরোষে ধর্মব্যবসায়ী

গত ৮ জুন ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগে নারায়ণগঞ্জ থেকে অংশ নেন মোজাহেদা কিরণ ইসলামসহ আরও কয়েকজন। এসময় 'বন্ধু কাউন্টার' সংলগ্ন একটি সুপার মার্কেটে তারা পত্রিকা বিক্রি করতে গেলে একজন দোকানদার তাদের কাছে পত্রিকা চায়। একজন মোজাহেদা তাকে পত্রিকা দিতে গেলে পাশে থাকা এক ধর্মব্যবসায়ী এসে পত্রিকাটি টান দিয়ে নিয়ে যায়। এসময় সে পত্রিকাটি উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে এবং দীর্ঘ সময় তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। একপর্যায়ে সে হেযবুত তওহীদ ও মাননীয় এমাম সম্পর্কে কটূক্তি করতে শুরু করেন। তখন মোজাহেদা কিরণ ইসলাম দৃঢ়ভাবে তাকে জবাব দেন যে, এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন এখন আবার উল্টাপাল্টা কথা বলছেন কেন? আশপাশের দোকানদাররাও ধর্মব্যবসায়ীর এমন আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। তারা স্পষ্টভাবে বলেন, "আমরা হেযবুত তওহীদের এমামের সম্পর্কে জানি, আর তোদের মতো ধর্ম বিক্রেতাদেরও চিনি। তোরা ধর্মব্যবসায়ী।" ধর্মব্যবসায়ী ব্যক্তি তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনারা কি হেযবুত তওহীদের সদস্য? উত্তরে দোকানদাররা বলেন, "হ্যা, আমরা সবাই হ্যার সদস্য। এখন এখান থেকে বের হ, হারামখোর!" এরপরে তাকে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে ও ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেয়। এভাবেই বিরোধিতা করতে এসে জনরোষের শিকার হন ধর্মব্যবসায়ী ব্যক্তিটি।

ধর্মব্যবসায়ীর চোখ রাঙানি-মোজাহেদার ডোন্ট কেয়ার!

গত ৯ জুন ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগে অংশ নিতে মাঠে নামে সুনামগঞ্জ জেলার নারী সম্পাদিকা মাফিকুল ইসলাম সোহানা। সাথে ছিল তার মেয়ে তাহমিনা আক্তার এবং একজন ভাই মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। তারা বাদাঘাট বাজারে পত্রিকা বালাগ করতে যায়। এসময় একটি দোকানে পত্রিকা নিয়ে গেলে লেবাসধারী ধর্মব্যবসায়ীদের সাথে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। দোকানদার যখন পত্রিকাটি কিনতে যাবে তখন দোকানে বসে থাকা ধর্মব্যবসায়ীরা তাকে বলে 'এটা হেযবুত তওহীদের পত্রিকা। এই পত্রিকা নিতে হবে না। এরা ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তিকারী একটি সংগঠন'। এসময় মাফিকুল ইসলাম তাদের কথার প্রতিবাদ করে বলে যে, আপনারা কেন শুধু শুধু মিথ্যাচার করছেন? কারো সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে না বুঝে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তখন তারা তাকে বাজার থেকে চলে যেতে বলে। পাশের আরেক মোল্লা বলে উঠে যদি এই বাজারে যদি পত্রিকা বিক্রি করো তাহলে তোমাদের জন্য বিপদ হবে। তখন নারী নেত্রী মাফিকুল ইসলাম তাদের বলে যে 'কেন বিপদ হবে? আমরা তো এই পত্রিকার মাধ্যমে একটি আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরছি। কাজেই আমি যেহেতু পত্রিকা বিক্রি করতে এসেছি তাই পত্রিকা বিক্রি করেই যাব। তার এই দৃঢ়তা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা সাথে সাথে ফেসবুকে উস্কানিমূলক পোস্ট দিতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে চার/পাঁচজন করে করে মাদ্রাসার ছাত্র একত্রিত হতে থাকে। তাদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই মোজাহেদারা বালাগ চালিয়ে যায়। এতে ধর্মব্যবসায়ীরা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সৃষ্টির সাহস পায় না। অতঃপর তাদের হুমকি ধামকি উপেক্ষা করেই বলিষ্ঠভাবে সারাদিন পুরো বাজারে পত্রিকা বিক্রি করে মাফিকুল ইসলাম সোহানার টিম। এরপর পত্রিকা শেষ হলে তারা কাজ শেষ করে বাজার থেকে চলে আসেন। এভাবেই আল্লাহ ধর্মব্যবসায়ীদের অবস্থান ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছেন আর হেযবুত তওহীদের অবস্থানকে মজবুত করছেন।

কারাগারে ২৮ দিন

মিকাইল হোসেন

আমি মিকাইল হোসেন। আন্দোলনে যোগদান করি ২০১১ সালে। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার গোড়াইয়ে বসবাস করছি এবং মির্জাপুর উপজেলার দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আন্দোলনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত তিনবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০১২ সালে মাগুরায়, ২০১৩ সালে ঢাকায় পত্রিকা বালাগে গিয়ে এবং ২০১৫ সালে জামালপুরে পিডিবি বালাগ চলাকালে। এরমধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে জামালপুরের পিঙ্গলহাটী গ্রামে এক চায়ের দোকানে মাননীয় এমামের বক্তব্য পিডিবিতে প্রচারের সময়। একজন ধর্মব্যবসায়ী আলেম ৮-১০ মিনিট বক্তব্য শোনার পর আপত্তি তোলে এবং তা বন্ধ করতে বলেন। আমি জানাই, আমরা প্রশাসনের অনুমোদন নিয়েই কাজ করছি। এতে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তর্কে জড়ায় এবং আশপাশের লোকজন ডেকে আনে। তখন আমরা ছিলাম মাত্র তিনজন, আমি, সাজু ভাই ও তোফাজ্জল ভাই। জেলা আমির আনোয়ার হোসেনকে ঘটনাটি জানানোর পর তিনি এমদাদুল হক ভাইকে পাঠান। এরই মধ্যে সেখানে দুই-তিন শতাধিক মানুষ জমে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা আমির থানায় যোগাযোগ করেন।

এরপর সেই আলেম দুই গাড়ি ভর্তি ফিকাহ ও হাদিসের বই নিয়ে আসে তর্ক করার জন্য। আমি বলি, ইসলাম বোঝার জন্য আল্লাহর কোর'আনই যথেষ্ট। আমরা যুক্তিসহ উত্তর দিতে থাকলেও তারা পুলিশকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে আমাদের থানায় নিয়ে যায়। পরদিন কোর্টে তোলা হলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, আমরা নাকি মানুষের ঈমান নষ্ট করেছি। আর মহামান্য এমামুয্যামান নাকি নিজেকে নবী দাবি করেছেন। তখন আমরা দলিল দিয়ে প্রমাণ করি, এমন কোনো দাবি কখনও করা হয়নি। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের জামিন না দিয়ে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। তাই আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা হয়। কেবল উন্মুক্ত সময়েই অন্য ভাইদের সঙ্গে দেখা হত। জেলখানার খাবার ছিল অতি নিম্নমানের মোটা চালের ভাত, শুধুই মুলার তরকারি আর বালি-মেশানো রুটি। আমি সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতাম এবং জেলখানার ভিতরে আন্দোলনের বালাগ দিতাম। অধিকাংশই আন্দোলনের ব্যাপারে বিরূপ থাকলেও একজন আগ্রহ নিয়ে শুনতেন।

এদিকে পুলিশ আমাদের চার্জশিটে মিথ্যা অভিযোগ লিখে যে, আমরা নাকি 'জিহাদি শিক্ষা' দিই। এই কারণে আমাদের জামিন বিলম্বিত হচ্ছিল। অতঃপর ২৮ দিন জেলে থাকার পর পুলিশের চাপেই ম্যাজিস্ট্রেট চার্জশিট গ্রহণ করেন এবং আমাদের জামিন মঞ্জুর হয়। কারামুক্তির সময় আমাদের মোবাইল ও ব্যাগ ফিরিয়ে দিলেও মোটরসাইকেল ফেরত দেয়নি। বরং মোবাইল ও ব্যাগ ফেরত দেওয়ার জন্য উল্টো ২০০০ টাকা দাবি করে। এরপর দীর্ঘ এক বছর হয়রানির পর আমরা মোটরসাইকেল ফিরে পাই। আমরা চারজন, মিকাইল (ঝিনাইদহ), তোফাজ্জল (ময়মনসিংহ), এমদাদুল হক (জামালপুর), সাজু আহমেদ (জামালপুর) ২০১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই মামলার হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি। এ মামলা নিয়ে নানা সময়ে আমাদের অনেক হয়রানি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা থেমে যাইনি। আজও আমরা নিরলসভাবে আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।

শুভ জন্মদিন

নাম : আফনানা তানভীর আরাবি পিতা : আব্দুল কাইয়ুম

জন্ম তারিখ : ১২ আগস্ট ২০২৩ মাতা: খাদিজা খাতুন

আখবারে তওহীদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায় সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

রংপুর হামলার পাঁচ মাস, মেলেনি ন্যায়বিচার

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ছিদামহাটের ছিলাম বাজার এলাকায় গুজব ছড়িয়ে হেযবুত তওহীদের আটটি পরিবারের বাড়িতে হামলা চালায় একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী। ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের সেই বীভৎস দৃশ্য আজও এলাকাবাসীর চোখে ভাসে যেন হিংস্র হায়েনার থাবা নেমে এসেছিল নিরীহ মানুষের উপর। ঘটনার পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো নেই কোনো দৃশ্যমান আইনি অগ্রগতি। পোড়া ঘরের চাল, গাছের জ্বালা আর চোখের জলে এখনো বহন করে চলছে সেই দিনের যন্ত্রণা। গাছের গুঁড়িতে কচি ডগা গজিয়েছে, কিন্তু ঘরহারা পরিবারগুলো আজও আশ্রয়, নিরাপত্তা কিংবা স্বাভাবিক জীবনের ছায়া থেকে বঞ্চিত। নিজভূমে আজও তারা উদ্বাস্তু।

গত ৫ জুলাই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী জনাব নিজাম উদ্দিন আমির। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন ভাইবোনদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িগুলো, কথা বলেন তাদের সঙ্গে। আমিরকে দেখে রংপুরের মোজাহেদ-মোজাহেদারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। চোখের জলে প্রকাশ পায় তাদের জমে থাকা কষ্ট। নিজাম আমির সকলকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান এবং বলেন সত্যের বিজয় হবেই। অন্যায়কারীরা একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হবেই মানুষের কাছেও, আল্লাহর কাছেও। ছিন্নভিন্ন এই পরিবারগুলোর এখন সবচেয়ে বড় চাওয়া ন্যায়বিচার ও পুনর্বাসন। তারা ফিরে পেতে চায় হারানো স্বাভাবিক জীবন ও সম্মান। প্রশ্ন হলো তারা কি আদৌ তাদের প্রাপ্য ফিরে পাবে? নাকি রাষ্ট্রীয় নীরবতার আড়ালে হারিয়ে যাবে আরও একটি মানবিক বিপর্যয়ের ইতিহাস? সময়ই বলে দেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, না কি বিচারহীনতার অন্ধকারে ঢেকে যাবে ছিদামহাটের ভাঙ্গা হৃদয়গুলো। আল্লাহ আমাদের ভাইবোনদের যেন ধৈর্য্য ধারণ করার তওফিক দান করেন।

পাবনায় জামিন পেলেন হেযবুত তাওহীদের তিন সদস্য

গত ১৪ জুলাই সোমবার দুপুর ২টায় পাবনা জেলা অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. মোরশেদুল আলমের তত্ত্বাবধায়নে পাবনায় জামিন পেয়েছেন হেযবুত তাওহীদের তিন সদস্য। জামিন প্রাপ্তরা হলেন পাবনা জেলা হেযবুত তওহীদের মো. সেলিম শেখ, মো. উজ্জল শেখ, মো. বিজয় মণ্ডল। আদালত ও মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের চরঘোষপুর নফসারের ভাটা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় ধারাল অস্ত্র নিয়ে হেযবুত তওহীদ সদস্যদের উপর সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী হামলা চালায় একটি গোষ্ঠী। এ ঘটনায় হেযবুত তওহীদের ১০-১২ জন সদস্য আহত হয়। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা ছিল গুরুতর। হামলার সময়

দুই রাউন্ড গুলিও ছোঁড়ে সন্ত্রাসীরা। হামলার পরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পাবনা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষেরই দুটি মামলা হয়। প্রথমে হেযবুত তওহীদের পক্ষে মো. মনিরুল মণ্ডল বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২৫-৩০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে সাইফুল ইসলাম খোকন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। অবশেষে সেই মামলায় গত ১৪ জুলাই জামিন মঞ্জুর হয় হেযবুত তওহীদের তিন সদস্যের।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মিথ্যা মামলা থেকে খালাস

প্রায় ১৬ বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন হেযবুত তওহীদের ১২ জন সদস্য। বুধবার (২৩ জুলাই ২০২৫) ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাদের সকলকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। একটি মিথ্যা মামলার জেরে জীবনের মূল্যবান সময় ও সম্মান হারানোর পাশাপাশি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের। অবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ দয়ায় এই মিথ্যা মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন হেযবুত তওহীদের সদস্যরা। খালাসপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সংগঠনটির বর্তমান সদস্য আনিসুর রহমান সাকিব, আমিনুল ইসলাম, মোফাজ্জল হোসেন, এবিএম রায়হান সরকার, মো. মোস্তফা তালুকদার, রেনুআরা বেগম, সুফিয়া বেগম, শাহিনুর আক্তার এবং সাবেক সদস্য মো. আব্দুর রাকিব, মো. রাজু আহমেদ, মো. নুরুল ইসলাম সজল ও রুমি ইসলাম।

জানা যায়, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার ফায়দাবাদ এলাকার বাসা থেকে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হেযবুত তওহীদের এই সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে ৫৪ ধারায় এবং পরে ১৫৩/১৫৩-ক/৫০৫/৫০৫(ক) ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেওয়া হয়। আড়াই বছর আটক থাকার পর ২০১২ সালে জামিনে মুক্তিলাভ করেন তারা। এরপর পৃথক পৃথকভাবে তাদের কয়েক দফায় পুলিশ, ডিবি ও র‍্যাব রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। দীর্ঘ ১৬ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে ২০২৫ সালের ২৩ জুলাই এই মিথ্যা মামলা থেকে রেহাই পান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্যরা।

নাটিকা

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

নাটকের নাম: "একটি মব নাটক"

রিয়াদুল হাসান

→ দৃশ্যপট:- স্থান: কাজলার একটি মাদ্রাসার সামনে এবং আশপাশের এলাকা; তারিখ: ৬ আগস্ট ২০২৫; পাত্রপাত্রী: হেযবুত তওহীদের সদস্য (৪ জন), মাদ্রাসার মৌলবিগণ, তালেবান ঘরানার কিছু মানুষ, স্থানীয় আমির, জনতা (পাবলিক), সিনিয়র মুরব্বি।

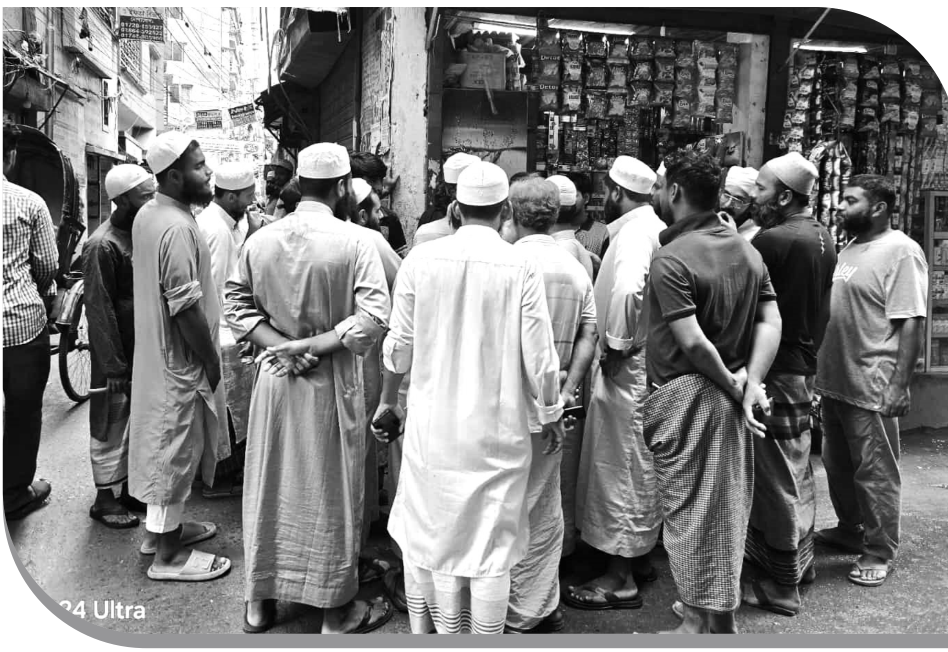

- ## দৃশ্য ১: মাদ্রাসার সামনে

(হেযবুত তওহীদের কয়েকজন সদস্য প্রচারপত্র বিলি করতে করতে মাদ্রাসার সামনে আসে। কয়েকজন মৌলবি বের হয়ে আসে।)

মৌলবি: এই তোমরা কারা?

সদস্য: আমরা অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের সদস্য।

মৌলবি: তোমরা নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না, কীসের ইসলামের কথা বলো?

সদস্য: আপনাকে কে বলেছে এই মিথ্যা কথা? আমরা নামাজ পড়ি না, রোজা রাখি না?

মৌলবি: সত্যমিথ্যা পরে হবে। আগে মাদ্রাসার ভিতরে চলো? তোমাদের কথা ঠিক নাকি আমাদের কথা ঠিক সেটা প্রমাণ হবে। আমাদের বড় হুজুর আসবে। তোমাদের সাথে বাহাস হবে।

সদস্য: দেখেন, আমরা বাহাস করতে আসিনি। এটা সরকারি রাস্তা। বাংলাদেশের সবার ধর্মীয় অধিকার আছে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করার। আপনার ভালো লাগলে নেন, না লাগলে গণ্ডগোল করবেন না।

(এই সময় মাদ্রাসা থেকে কয়েকজন বড় দাড়িওয়ালা তালেবান ঘরানার লোকজন আসে। চারপাশে ভিড় বাড়তে থাকে।)

কয়েকজন মৌলবি (চেঁচিয়ে): হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ!

সদস্য: মিথ্যা কথা বলেন কেন? আপনার কাছে প্রমাণ আছে? হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ না।

মৌলবিরা: (টানা-হ্যাঁচড়া করতে করতে) আজকে দেখামুনে তোরা কত বড় মুসলমান হইছস!

(ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার, উত্তেজনা বাড়ে। কয়েকজন তালেবান ফেসবুক লাইভ করতে থাকে।)

• দৃশ্য ২: উত্তেজনা চরমে, হেযবুত তওহীদের আমিরের আগমন

(স্থানীয় আমির হন্তদন্ত করে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন। সাথে সাথে তিনি ফোনে প্রশাসনকে জানান। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ভিড় বাড়তে থাকে।)

আমির: এই ভাই, আপনার কী সমস্যা আমাকে বলেন।

(তালেবানদের কয়েকজন আমিরকে টেনে মসজিদের ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা করে।)

তালেবান: তোরা নামাজ পড়স না!

আমির: এই মিথ্যা কথা আপনাদেরকে কে বলেছে?

তালেবান: তাহলে চল এখন নামাজ পড়বি। নামাজ না পড়লে হাদিসে আছে বেত মারতে হবে। তোদেরকে বেত মাইরা নামাজ পড়ামু।

(পাবলিকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে)

এগুলো নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না। আবার ইসলামের কথা বলতে আইছে। এগুলো ইসলামের শত্রু!

(জনতার একাংশ হা করে চেয়ে থাকে, কিছুজন উত্তেজিত হয়ে তালেবানদের সমর্থন করে।)

আমির: (উচ্চ কণ্ঠে, আঙ্গুল উঁচিয়ে) দেখেন, আপনি মিথ্যা হাদিস বলছেন। নামাজ না পড়লে পিটাইয়া মসজিদে নেওয়ার হুকুম মিথ্যা। যদি হাদিস সত্যিও হয়, সেটা আপন সন্তানের বয়স সাত বছর হলে, তাকে শাসনের কথা বলা হয়েছে নামাজের জন্য। কিন্তু রাস্তা থেকে মানুষ ধরে এনে পিটিয়ে নামাজ পড়ানোর হাদিস মিথ্যা।

(জনতা চুপ হয়ে যায়।)

হেযবুত তওহীদের সদস্যরা: নিষিদ্ধ যদি হয়ে থাকে তাহলে থানায় চলেন, থানায় ফায়সালা হবে।

(থানার কথা শুনে তালেবানরা একে একে ছড়িয়ে পড়ে।)

• দৃশ্য ৩: আবার উত্তেজনা

(হেযবুত তওহীদের সদস্যরা মেইন রোডের দিকে অগ্রসর হলে সামনে পড়ে আরেকটি বড় মসজিদ। আবার উত্তেজনা তৈরি হয়। নতুন তালেবানরা জটলা পাকায়, ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। তওহীদের কিছু সদস্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও এক সিনিয়র মুরব্বির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়।)

আবৃত্তি (পটভূমিতে): এই যাত্রায় আদর্শের কাছে পরাজিত হয় মব কিলিং, পরাজিত হয় উগ্র ধর্মব্যবসা।

• দৃশ্য ৪: থানায় অভিযোগ এবং পরবর্তী প্রস্তুতি

রাতে থানায় হেযবুত তওহীদের সদস্যরা নির্দিষ্ট তালেবানদের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করে। তদন্তে পুলিশের পক্ষ থেকেও ঘটনার সত্যতা ধরা পড়ে। পরদিন তালেবানরা আবার কাজলা পেট্রোল পাম্পের সামনে জটলা পাকায়। থানার দিকে মিছিল করার প্রস্তুতি নেয়। মসজিদে মসজিদে ছড়িয়ে পড়ে তারা।

(দর্শকের জন্য খোলা প্রশ্ন রেখে নাটক শেষ হয়: "আদর্শ না উগ্রতা? সত্য না গুজব? এই সমাজ কোন পথ বেছে নেবে?")

শেষ।

ভ্রমণ কাহিনী

মারায়ন তং ও আলীর গুহার এডভেঞ্চার

শামীমা আক্তার

ফেব্রুয়ারির মৃদু শীত, রাত ঠিক নয়টা। রিকশায় চেপে পৌঁছে গেলাম আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে। আগেই পৌঁছে গেছে আমার সহপাঠীরা, চেনা মুখগুলো যেন ভ্রমণের আগাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত। গন্তব্য বান্দরবানের পাহাড়ঘেরা আলীকদম উপজেলা। বাস আসতে খানিক দেরি হচ্ছিল, তাতে অবশ্য কারও উৎসাহে ভাটা পড়েনি। সবাই মিলে ছবিতে বন্দি করে রাখলাম সেই উচ্ছ্বসিত মুহূর্তগুলো। অবশেষে রাত প্রায় ১১টায় আমাদের বাস এলো। আমরা বাসে উঠে গান ধরলাম, হেসে-খেলে গল্পে মেতে উঠলাম। তারপর সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল নিজ নিজ সিটে। ভোরের আলো ফোটার আগেই (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ছয়টায় পৌঁছালাম চকরিয়া বাসস্ট্যান্ড। বাস থেকে নামতেই হিমেল হাওয়া আমাদের স্বাগত জানাল। আধুনিক স্যানিটেশন বা অন্যান্য অনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাব কিছুটা অসুবিধে তৈরি করলেও আমাদের উচ্ছ্বাসে তার আঁচ লাগেনি। হাতমুখ ধুয়ে, কাছের একটি হোটেলে সেরে নিলাম সকালের নাস্তা।

এরপর আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত 'চান্দের গাড়ি'তে করে রওনা হলাম লামার উদ্দেশ্যে। চান্দের গাড়িতে করে পাহাড়ি পথ পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। ঠাণ্ডা হাওয়া কানে যেন পাহাড়ি বাঁশির মতো বাজছিল, আর দুই পাশের সারি সারি পাহাড় নীরবে দাঁড়িয়ে জানান দিচ্ছে তাদের আদিম সৌন্দর্যের। কেউ ভিডিও করছিল, কেউ বা গান ধরেছিল; আবার কারও চোখে ছিল অপার বিস্ময়। এই অপরূপ সৌন্দর্য কি আর ক্যামেরা বন্দী করা সম্ভব! প্রায় এক ঘণ্টার যাত্রা শেষে পৌঁছালাম আলীকদমের লামা এলাকায় অবস্থিত 'ইয়াসিন হোটেল'-এ। প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি খাবার হোটেল, টিনের ছাউনিতে গড়া। আগে থেকেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল। সেখানে হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা আর হালকা নাশতা সেরে নিলাম। ওই হোটেল থেকে আমরা ভ্রমণ গাইডও পেলাম।

- বাদুর গুহা

হোটেলে ব্যাগপত্র রেখে অটোরিকশায় চেপে রওনা হলাম বাদুড় গুহার উদ্দেশ্যে। প্রায় এক ঘণ্টা পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথে চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। সঙ্গে ছিলেন আমাদের দুই ভ্রমণ গাইড। চারপাশের দৃশ্যপট যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিখুঁত এক

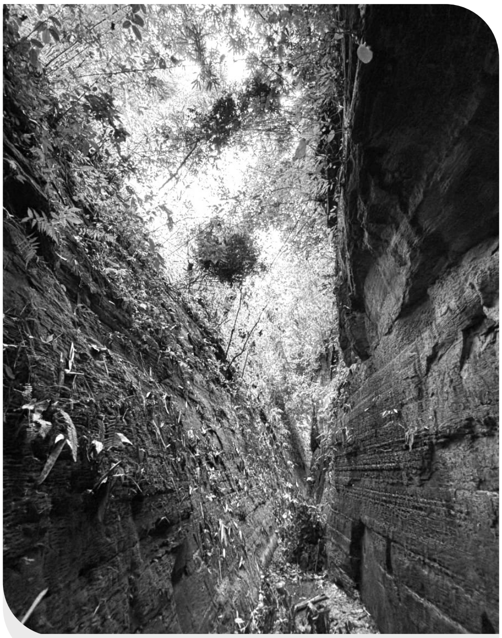

ক্যানভাস। দু'ধারে সুউচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু-একটা ছোট ঝুমঘর। সেখানে বাস করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ। মনে হচ্ছিল তারা আমাদের চেনাজানা ব্যস্ত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যেন স্বনির্ভর জীবনযাত্রা আর নির্মল ছায়াঘেরা নির্জন এক দ্বীপে তাদের বসতি। কোথাও দু-একটা পাহাড়ি বাচ্চা খেলছে, কেউবা ঘরের সামনেই নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, আবার কেউ ঝর্ণার ধারে কাঁকড়া ধরছেন। পাহাড়ের বিশালতা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতা থেকে অনেকতা মুক্ত করে। সারি সারি পাহাড়ের মাঝে মেঠো পথ দিয়ে ঘণ্টাখানেক হেঁটে পৌঁছালাম বাদুড় গুহার সামনে, তবে কর্দমাক্ত ও ভেজা জায়গা দেখে আর ভেতরে ঢোকা হয়নি। সেখানে ঝর্ণার বরফঠাণ্ডা পানি খেয়ে আমরা সবাই তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। ফিরতি পথে স্থানীয়দের বড়ই গাছ থেকে সবাই মিলে বড়ই পেড়েছিলাম। যদিও ফলগুলো তখনো তেমন পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি, তবুও শৈশবের মত আনন্দে মেতে উঠাই ছিল মুখ্য। সেখান থেকে হোটেলে ফিরতে প্রায় বিকেল হলো, আমরা ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম।

- মারায়ন তং পাহাড়

বিকেলবেলা আমরা রওনা হলাম মারায়ন তং পাহাড়ের উদ্দেশে। এটি বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার মিরিঞ্জা রেঞ্জে অবস্থিত, স্থানীয়রা যাকে নানা নামে চেনে, মারায়ান তং, মারায়ং তং, মেরাই থং জাদি ইত্যাদি। প্রায় ১৬৪০ ফুট উচ্চতার এই পাহাড়ের চূড়ায় কোনো দোকান বা জনবসতি নেই। যেহেতু রাতে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাম্প করে থাকব, তাই কিছু শুকনো খাবার ও পানি কিনে নিলাম। আমাদের ব্যাগপত্র হোটেলের কর্মীরা পাহাড়ে উঠিয়ে দেয়।

আমরা অটোতে করে পৌঁছালাম পাহাড়ের পাদদেশে, সেখান থেকে শুরু হলো আমাদের ট্রেকিং (Trekking)। মিরিঞ্জা পর্বতমালার মধ্যে মারায়ন তং সবচাইতে উঁচু এবং খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে মোট ৫টি ট্রেইল পাড়ি দিতে হয়। সবচেয়ে খাড়া ট্রেইলটি ৭২ ডিগ্রি কোণে ভূমি থেকে চূড়ার দিকে উঠে গেছে। মারায়ন তং -এর সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে গেলে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হয়। আমরা ট্রেকিং শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে যাই। তখনও বেশ রোদ, আর বেশ গরম। আর প্রায় সবারই এটা প্রথম ট্রেকিং। তাই আমরা ধীরে-সুস্থে উঠছিলাম, একটু পর পর বসে কিছুটা বিশ্রাম করছিলাম, অল্প অল্প করে পানি খাচ্ছিলাম যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়। যদিও ওঠাটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য, তবু চারপাশের নির্মল প্রকৃতি আর পাদদেশের অপূর্ব দৃশ্য নিচে তাকালেই এমন আকৃষ্ট করছিল যে ডিমোটিভেট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ট্রেকিংয়ের সময় কদাচিৎ দুই-একটা ঝুমঘর চোখে পড়ে, দুই একটা পরিবার সেখানে বসবাস করে। যদিও ওই পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ত্রিপুরা, মারমা, মুরংসহ নানা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ দেখেছি, তবে পাহাড়ের এত উপরে বিচ্ছিন্ন দুই-একটা ঝুমঘর দেখে বেশ অবাক হলাম। প্রকৃতির মাঝেই তাদের বসবাস, দেখে যদিও মনে হয় অনাবিল শান্তি, তবে বাস্তবে তাদের জীবন প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য। তারা যেন এক নিঃসঙ্গ, স্বনির্ভর জগতে বাস করে। স্থানীয় ছেলেরা দেখলাম বাইক নিয়ে এই খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এমন সুউচ্চ পাহাড়ে বাইক চালানো দেখে আমার গা শিউরে উঠে। কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং, আর অনেক অভিজ্ঞতা এবং সাহসের ব্যাপার। যদিও বাইকে করেও ওঠার সুযোগ ছিল, তবে আমরা ট্রেকিং করেই চূড়ায় পৌঁছানোর আনন্দ উপভোগ করতে চাইছিলাম।

প্রায় তিন-চার ঘণ্টা ট্রেকিং শেষে পৌঁছালাম পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে পাহাড়ের কোল ঘেষে সারি সারি ৯/১০ টা টেন্ট, আর একদম কিনারায় একটা দোলনা পাতা। পাহাড়ের কিনারায় ঝুলন্ত দোলনায় বসে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় আর সুবিশাল আকাশের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন কল্পলোকের বাস্তব রূপ। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সূর্যাস্ত উপভোগ করতে আমরা পাহাড়টির সর্বশেষ চূড়ায় উঠলাম, যা ছিল সবচেয়ে দুর্গম। চূড়াটি এত খাড়া ছিল যে উঠার সময় ভয়ে হাত-পা কাঁপছিল। এই পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটি বৌদ্ধ উপাসনালয়। খোলা প্রকৃতির মাঝে বৌদ্ধের বিশাল মূর্তি এই জায়গাটিকে আরও গাম্ভীর্যময় করে তুলেছে। দিগন্তজোড়া পাহাড় আর নিচে সাপের মতো বয়ে চলা

মাতামুহুরী নদী, যত দূর চোখ যায় শুধু পাহাড়ের ঢেউ, সবকিছু মিলিয়ে এ যেন এক কল্পনার রাজ্য। সূর্যাস্তের রাঙা আলো পাহাড়ের গায়ে জেগে থাকা বৃক্ষরাজির উপর পড়ে সোনালি জ্যোতি ছড়াচ্ছিল। আমার দেখা সবচাইতে সুন্দরতম সন্ধ্যা।

এরপর আবার ফিরে আসি টেন্টে। রাতে সেখানে ছিল একদম হাড় কাঁপানো শীত, আর প্রচুর ঠাণ্ডা বাতাস। দিনের প্রচণ্ড গরমে শীতবস্ত্র আনাটা অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও, এখন যেন সে শীতবস্ত্রেও ঠাণ্ডা মানানো যাচ্ছে না। ক্যাম্প ফায়ার জ্বালিয়ে ছেলেবেলার মতো এলন্টি-বেলন্টি খেলা, দৌড়ঝাঁপ আর গল্পে জমে ওঠে রাত। এরপর আমরা বারবিকিউ করি, সাথে হোটেল থেকে নিয়ে আসা পরোটা দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিই। এরপর সবাই নিজ নিজ টেন্টে ঘুমাতে যাই, কেউ কেউ ঘুমানোর আগে নাপা খেয়ে নিল, কারণ সারাদিনের ধকলের পর পায়ে ছিল প্রচণ্ড ব্যথা। রাতের অসহনীয় ঠাণ্ডায় বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল।

পরের দিন ভোরে সূর্যোদয় দেখতে আমরা আবার সেই চূড়ায় উঠি। যদিও ঘন কুয়াশার চাদরে সূর্য ঢাকা ছিল। তবুও সেই আলোর লুকোচুরি, নিচের পাদদেশ ঢেকে রাখা কুয়াশার চাদর, সব মিলিয়ে ছিল অনন্য এক অভিজ্ঞতা। তারপর টেন্টে ফিরে এসে আমরা পাহাড় থেকে নামার প্রস্তুতি শুরু করি। খাবার পানি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমাদের দ্রুত নামতে হবে লোকালয়ে। নামার আগে সুন্দর দৃশ্যগুলো যতটা সম্ভব ক্যামেরাবন্দি করে নিচ্ছিলাম।

নামতে গিয়ে টের পেলাম, পা ব্যথায় কতটা কাবু হয়েছে, পা যেন পুরো বিদ্রোহ শুরু করেছে। প্রত্যেক স্টেপে সেই বিদ্রোহ টের পেলাম। পাহাড় থেকে নামাটাও খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল, শুকনো আর ধুলোমাখা পথ, একটু অসাবধান হলেই ধুলো আর মাটির কাঁকরে পা পিছলে যাবে। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে নামছিলাম। মাঝেমধ্যে দুই-একজন পা পিছলে মাটিতে পড়েও গেছে। আমরা ৩/৪ জন করে হাত ধরে নামছিলাম, যেন ব্যালেন্স রাখতে পারি। নামার সময় বার বার মন পিছু টানছিল, এই অপরূপ সৌন্দর্য ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বার বার নয়ন ভরে দেখে নিচ্ছিলাম চারপাশের সৌন্দর্য। শেষে ফিরে এলাম হোটেলে, ফ্রেশ হয়ে সবাই সকালের নাস্তা করে নিলাম।

- আলীর গুহা

মারায়ন তং পাহাড় থেকে ফিরে আমরা রওনা দিলাম আলীর গুহার উদ্দেশে। গুহায় প্রবেশের আগে এই রহস্যময় গুহা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আলীর গুহায় ঢুকতে পাড়ি দিতে হয় দুই পাহাড়ের মাঝে সরু পথ, পথটা এতটাই সংকীর্ণ যে একজন একজন করে ঢুকতে হয়। সেই সরু পথটায় আবার হাঁটু সমান পানি। প্রথমে পানিতে পা রেখে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠি। কি মারাত্মক ঠাণ্ডা পানি! বাহিরে এত রোদ্দুর, আর এখানে পানি যে এটি শীতল হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা ছিল না। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যে সেই শীতলতায় মানিয়ে নিলাম। শুরু হলো এডভেঞ্চার। জল, পাথর, অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল সব মিলিয়ে এক রহস্যময় জগত। আলীর গুহা, যাকে কেউ বলে আলীর সুড়ঙ্গ, মূলত তিনটি গুহার সমন্বয়ে তৈরি। গুহায় পৌঁছাতে হয় ঝিরি পথ ধরে, একটিতে সিঁড়ি থাকলেও বাকি দু'টিতে পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়। প্রবেশের সাথে সাথে মনে হবে যেন এক গা ছমছমে জগতে প্রবেশ করলাম। গুহার ভেতর এতটাই অন্ধকার যে টর্চ ছাড়া কিছু দেখা সম্ভব না। দ্বিতীয় গুহায়ও ঢুকি, কিন্তু তৃতীয় গুহা এতটা সংকীর্ণ ছিল যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হতো, তাই আমাদের অধিকাংশই আর সাহস পেলাম না। শুধু দুইজন ভেতরে ঢুকেছিল, তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। আলীর গুহার অ্যাডভেঞ্চার আসলে শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়তো সম্ভব নয়। আমাদের জন্য এটা ছিল দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস।

- মাতামুহুরী নদী

আলীর গুহা থেকে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি দিনের শেষ গন্তব্য মাতামুহুরী নদীর উদ্দেশে। নদীতে ঘোরার জন্য একটা ছোট্ট ট্রলার ভাড়া করি। হালকা চা-বিস্কুট খেয়ে সবাই নৌকায় চেপে বসি। নদীর দুই কূল ছুঁয়ে থাকা পাহাড় আর মাঝে বয়ে চলা নদী যেন এক জীবন্ত ক্যানভাস। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝুম ঘর, পড়ন্ত সূর্য, সোনালী আভায় রঙিন আকাশ! এই দৃশ্য শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না। নদীর মাঝপথে চোখে পড়ল লামার অন্যতম সুন্দর সাদা পাহাড়। আমরা সেই সাদা পাহাড়ের নিচে কিছুক্ষণের জন্য নেমেছিলাম। তারপর আবার নৌকায় যাত্রা শুরু করি। নদীতে নৌকায় বসে সারি সারি পাহাড়ের মাঝে সবাই মিলে সূর্যাস্ত উপভোগ করলাম। সন্ধ্যার পর আমরা নৌকা থেকে তীরে নামি। এরপর সিএনজিতে করে পৌঁছে যাই চকরিয়া বাসস্ট্যান্ডে। রাতের বাসে উঠে পড়ি ঢাকার পথে। যদিও শরীর তখন ক্লান্ত, কিন্তু মন পড়েছিল পাহাড়, গুহা আর ঝর্ণার মধ্যেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। ভোরবেলা ঢাকায় পৌঁছে চোখ মেলতেই মনে হলো, এ যেন কোন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা! একটা রঙিন স্বপ্ন, অথচ নিমিষেই ফুরিয়ে এল।

মোজাহেদা, উত্তরা শাখা
শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য-প্রযুক্তি

দৈনন্দিন কাজে সেরা কয়েকটি AI সহকারী

আরাফাত হোসেন সিফাত

→ বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI আমাদের জীবনে এক অনন্য বিপ্লব এনেছে। যেখানে আগে বিভিন্ন কাজ করতে সময়, শ্রম ও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হত সেখানে AI-এর সাহায্যে এখন কাজ অনেক দ্রুত, সহজ ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা, ব্যবসা, ডিজাইন, কনটেন্ট তৈরি, এমনকি প্রোগ্রামিংসহ সবখানেই AI হয়ে উঠেছে নির্ভরযোগ্য সহকারী। ছাত্রছাত্রী, উদ্যোক্তা, ডিজাইনার বা যে কেউ এই টুলগুলো ব্যবহার করে সময় বাঁচানোর পাশাপাশি দক্ষতা বাড়াতে পারেন। যেহেতু আন্দোলনের বালাগ কার্যক্রমের জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত অনলাইনভিত্তিক নানামুখী কাজ সম্পাদন করতে হয়। সেক্ষেত্রে সঠিক এআই টুলের ব্যবহার আমাদের কাজকে আরো অনেক গতিশীল ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। তাই অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আমাদের জন্য উপযোগী এমন ১০টি ফ্রি AI টুল সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

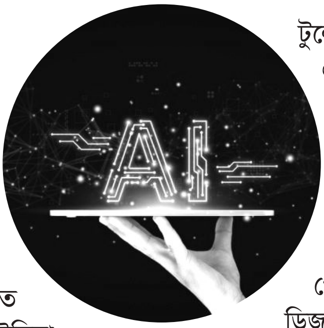

▪ ChatGPT

বর্তমান সময়ে AI টুলগুলোর মধ্যে চ্যাটজিপিটি জনপ্রিয়তার প্রায় শীর্ষে অবস্থান করছে বলা যায়। যেকোনো ইনফরমেশন জানা, প্রশ্ন-উত্তর, ব্লগ বা প্রবন্ধ লেখা, কোডিং, অনুবাদ, চিঠিপত্র লেখা, টেক্সট এডিটিং, ইংরেজী শেখাসহ নানামুখী কাজ করতে পারে এই এআই টুলটি। এমনকি আইডিয়া জেনারেট ও পরামর্শ প্রদানের মতো কাজও করে থাকে এটি। ব্যবহার করা সহজ ও ফ্রি ভার্সন থাকা বর্তমানে চ্যাটজিপিটির ব্যবহার বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছে। পড়াশোনা, লেখালেখি বা অনলাইনভিত্তিক কাজের জন্য এটি একটি অসাধারণ সহায়ক। এই এআই টুলের GPT-3.5 ভার্সনটি সম্পূর্ণ ফ্রিতে ব্যবহার করা যায়। Link: chat.openai.com

▪ Google Gemini

এটি Google-এর তৈরি শক্তিশালী AI চ্যাটবট। যেকোনো টপিক নিয়ে রিসার্চ করতে, প্রশ্নের উত্তর জানতে, লেখালেখি করতে বা কোডিং শিখতে এটি দারুণ সহায়ক একটি এআই টুল। যেকোনো ছবি একে দেখিয়েও প্রশ্ন করা যায়, ইনফরমেশন সংগ্রহ করা যায়। এটি Google Search-এর মতো নির্ভরযোগ্য তথ্য দেয়। Link: gemini.google.com

▪ Canva

কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট তৈরির একটি অত্যন্ত কার্যকরী টুল হলো Canva। এই এআই টুলে আছে অসাধারণ সব টেমপ্লেট, ছবি এবং ভিডিও ক্লিপ যা ফ্রিতে ব্যবহার করা যায়। Canva -এর নতুন AI আর্ট জেনারেটর আপনার ছবি বা ভিডিও তৈরির কাজকে আরও সহজ করবে। Canva-এর এই AI টুল দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, YouTube থাম্বনেইল, ব্র্যান্ডিং ডিজাইন, সিভি, প্রেজেন্টেশনসহ অনেক কিছু খুব সহজে বানানো যায়। Magic Write দিয়ে লেখাও তৈরি করা যায়। Link: canva.com

▪ Cutout.pro

একটি অল-ইন-ওয়ান AI টুল যা ছবি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ, মুখের সৌন্দর্য বাড়ানো, ছবি কার্টুনে রূপান্তর, এনিমেটেড ফেস তৈরির মতো কাজ করে। ছবি এডিটিং, পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি, বা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট বানানোর জন্য খুব সহজ আর কার্যকর টুল। কিছু কাজ ফ্রিতেই করা যায়, লগইন করলেই আরো সুবিধা পাওয়া যায়। Link: cutout.pro

▪ Remove.bg

এই AI টুল মূলত ছবি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে ব্যবহৃত হয়। এক ক্লিকে আপনি প্রোডাক্ট ফটো, প্রোফাইল পিকচার বা ডিজাইন তৈরির জন্য ঝামেলাহীনভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে ফেলতে পারবেন। এটি বিশেষ করে ডিজাইনার, অনলাইন দোকানদার ও সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারদের জন্য খুবই দরকারি। Link: remove.bg

ইতিহাস

হিরার রাজকন্যার সাথে নিরক্ষর সাহাবীর বিয়ে!

মোখলেসুর রহমান সুমন

পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশের নাম ছিল হিরা। আল্লাহর নবী একদিন তার সাহাবীদেরকে বললেন, এমন একদিন আসবে যখন তোমরা হিরা জয় করবে। রসুলের (সা.) এই কথা শুনে সাহাবীরা অবাক হয়ে যান। কেননা, পারস্য ছিল ওই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য। অন্যদিকে আরবদের অবস্থান ছিল ঠিক উল্টো। তারা ছিল সবচেয়ে দুর্বল। যেখানে এই দুর্বল আরবদের অত্যাচারেই সাহাবীরা অতীষ্ট, সেখানে পারস্যের হিরা জয় করা কিভাবে সম্ভব, তারা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু তারা জানতেন, আল্লাহর নবী মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যেহেতু বলেছেন, এই ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শুবিল। তিনি ছিলেন খুব সহজ-সরল, পড়ালেখা না জানা একজন মানুষ। তিনি তার স্বভাবজাত সরলতা নিয়ে রসুলকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর নবী, হিরা বিজয়ের দিন যদি আমি উপস্থিত থাকি, তাহলে কি আমি হিরার রাজকুমারী কিরামাকে বিয়ে করতে পারবো? আল্লাহর রসুল তার কথা শুনে হেসে দিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও, তাহলে অবশ্যই তাকে বিয়ে করতে পারবে। শুবিল (রা.) মনে মনে ভাবলেন, চাই না মানে! অবশ্যই চাই। হিরার রাজকুমারী কিরামা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। আরবরা তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী হিসেবেই জানতো। রসুল (স.) যখন শুবিলের সাথে তার বিয়ের অনুমোদন দিলেন, তখন সহজ-সরল শুবিল (রা.) খুবই খুশি হলেন এবং হারিয়ে গেলেন স্বপ্নের জগতে।

এই ঘটনার বহু বছর পরের কথা। আবু বকর (রা.) তখন মুসলিম উম্মাহর খলিফা। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী হতে থাকে। এমনকি যে পারস্য সাম্রাজ্যকে আরবরা একসময় বাঘের মতো ভয় পেত, খালিদের বাহিনী সেই পারস্যকে আক্রমণ করে বসে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনীকে তারা পরাজিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত পারস্যের সমৃদ্ধ নগরী হিরা বিজয় করেন। আর এভাবে রসুল (স.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, এই যুদ্ধে মুসলিম ফৌজে উপস্থিত ছিলেন সেই সহজ সরল সাহাবী শুবিল (রা.)। তিনি কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে গিয়ে বলেন, হে মহামান্য সেনাপতি, আল্লাহর নবী বলেছিলেন, আমরা যখন হিরা জয় করবো, তখন হিরার রাজকুমারী কিরামার সাথে আমার বিয়ে হবে। আপনি তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। তার এই কথা শুনে শুরুতে খালিদ (রা.) বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু কয়েকজন সাহাবী যখন এ ব্যাপারে সাক্ষী দিলেন, তখন খালিদ (রা.) বিষয়টি মেনে নেন এবং এ ব্যাপারে হিরার রাজকন্যাকে অবগত করে প্রাসাদে দূত পাঠান।

এ সংবাদ যখন হিরার রাজপ্রাসাদে পৌছে, তখন সেখানকার নারীরা কান্নায় ভেঙে পরে। তারা বিলাপ করে বলতে থাকে, রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক আর আভিজাত্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন যে রাজকন্যা, তিনি কিভাবে এক অশিক্ষিত গরীব আরববাসীর স্ত্রী হিসেবে বাকি জীবন পার করবেন? তবে সবাই বিলাপ করলেও রাজকন্যা কিরামা ছিলেন নিশ্চিন্ত। তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন, তোমরা শুধু শুধু চিন্তা করো না। আমি বিষয়টি দেখছি। বলে তিনি শুবিল (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে যান।

এদিকে শুবিল (রা.) অপেক্ষা করছেন, হিরার রাজকন্যার জন্য। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পরেছিলেন! এ সেই রাজকন্যা, যার সৌন্দর্যের কথা আরবদের মুখে মুখে রূপকথার গল্পের মতো প্রচলিত। আজ সেই রাজকুমারীকে নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, দুয়েক দিন বাদেই তাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে। শুবিল ভাবছেন হতে পারে সে রাজকুমারী, আর আমি সামান্য চাষাভূষা। তাতে কী? আল্লাহর নবী যে বিয়ের অনুমোদন দিয়ে গেছেন, তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আপন মনে যখন শুবিল (রা.) এতকিছু ভাবছেন, তখন তার তাবুতে প্রবেশ করেন একজন বৃদ্ধা নারী। তিনি জানতে চাইলেন, আপনি কি শুবিল?

সাহাবী বললেন, হ্যা আমিই শুবিল। কিন্তু আপনি কে? রাজকুমারী কিরামা কোথায়?

বৃদ্ধা নারী বললেন, আমিই রাজকুমারী কিরামা। আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

তার এই কথা শুনে শুবিল (রা.) যেন আকাশ থেকে পরলেন। তিনি আতকে গিয়ে বললেন, আপনি কিভাবে কিরামা হতে পারেন? যেখানে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী, আর আপনি একজন বৃদ্ধা।

তার এই কথা শুনে কিরামা হেসে দিয়ে বললেন, ওহে বোকা আরব, যখন আমি যুবতী ছিলাম, তখন নিঃসন্দেহে আমি সুন্দরী নারী ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বৃদ্ধা। বয়স আমার রূপ-সৌন্দর্য সবই কেড়ে নিয়েছে।

কিরামার এই কথা শোনার পর শুবিল (রা.) যেন কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তার সমস্ত স্বপ্ন যেন মুহূর্তের মধ্যে কাঁচের মতো ভেঙে গেল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, রসুল (সা.) এর সাথে এ ব্যাপারে তার কথা হয়েছে বহু বছর আগে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, কিরামা বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে। রসুল (সা.) নিশ্চয়ই আগে থেকেই বিষয়টা জানতেন। এজন্যই তার প্রশ্ন শুনে রসুল হেসে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, যদি আমি চাই, তাহলে কিরামাকে বিয়ে করতে পারবো। কিন্তু আমি কেন এই বৃদ্ধাকে বিয়ে করতে চাইবো! এতদিনের লালিত স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যাওয়ায় হতাশায় ভেঙে পরলেন শুবিল (রা.)।

তার এই অবস্থা দেখে রাজকুমারী কিরামা এর সুযোগ নেন। তিনি বলেন, কই? আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন না কেন? তার কথা শুনে শুবিল (রা.) আতকে ওঠেন। তিনি বলেন, আমি কেন তোমাকে বিয়ে করতে যাব, যেখানে তোমার সৌন্দর্যই হারিয়ে গিয়েছে?

কিরামা বললেন, তাহলে কি আমি চলে যাব?

উত্তরে শুবিল বলেন, তুমি যেতে পার, তবে অবশ্যই উপযুক্ত মুক্তিপণ দিয়ে।

কিরামা ছিলেন রাজকন্যা। মুক্তিপণের কথা শুনে তিনি মোটেই বিচলিত হন না। বরং তিনি নিজেই চাচ্ছিলেন এই বোকাসোকা আরবকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে মুক্তি পেতে।

তিনি শুবিল (রা.) কে বলেন, মুক্তিপণ হিসেবে আপনি কি চান?

শুবিল বললেন, এক হাজার দিরহাম। এক দিরহাম কম দিলেও আমি তোমাকে মুক্তি দেব না।

তার কথা শুনে কিরামা মনে মনে হাসলেন। কারণ তার কাছে এক হাজার দিরহাম ছিল হাতের ময়লা। তথাপি তিনি একটু মজা করতে চাইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই আরব যোদ্ধা খুবই সহজ সরল। তিনি বললেন, অল্প কিছু দিরহাম কম দিলে চলবে না?

শুবিল (রা.) খুবই গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, না। এক দিরহাম কমেও চলবে না।

অতঃপর কিরামা তার সেবিকাকে দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে এক হাজার দিরহাম আনিয়ে শুবিল (রা.) কে বুঝিয়ে দেন। শুবিল তাকে মুক্ত করে দেন আর অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে তার সহযোদ্ধা সাহাবীদের কাছে চলে যান। সাহাবীরা খুবই আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিলেন, এখানে কি ঘটে তা জানার জন্য। কেননা তারা সবাই ধারণা করছিলেন, বোকা- সোকা শুবিলকে কিরামার মতো ধুরন্দর নারী নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে ঠকাবে। শুবিলকে দেখামাত্রই তারা বললেন, ওহে শুবিল। রাজকুমারী কিরামা তোমাকে ঠকান নি তো? শুবীল (রা.) খুবই গর্বের সাথে বলেন, খুব চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। আমি এক হাজার দিরহাম বুঝে নিয়ে, তবেই তাকে মুক্তি দিয়েছি।

তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার সঙ্গীরা বললেন, হীরার রাজকন্যার কাছ থেকে তুমি মাত্র এক হাজার দিরহাম নিয়েছ? এরচেয়ে বেশি নিতে পারলে না?

তাদের কথা শুনে শুবিল (রা.) অধিক বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন, এক হাজারের চেয়ে বড় কোনো সংখ্যা আছে নাকি? সেটা কত? আমি তো জানি এক হাজারই সবচেয়ে বড় সংখ্যা!

তার এই কথা শুনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গীদের অবস্থা খারাপ হয়ে পরে। এই খবর যখন মুসলিম সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে যায়, তিনিও হাসি থামাতে পারেন না। নিজের নির্বুদ্ধিতা আর সহযোদ্ধাদের এমন হাসাহাসি দেখে বেচারা শুবিল (রা.) চুপসে যান।

পাঠক, সাহাবী শুবিল (রা.) এর এই ঘটনাটি খুবই মজার হলেও এর পেছনে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় শিক্ষা। তা হচ্ছে, এক সময় আরবরা এতটাই দুর্বল জাতি ছিল যে, পারস্য সাম্রাজ্যের কোনো প্রদেশে তারা আক্রমণ করবে, এটা তাদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। রসুল (স.) যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, এটা কিভাবে সম্ভব? কিন্তু ইসলাম নামক পরশপাথরের ছোঁয়ায় তারা মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে এতটাই শক্তিশালী জাতি হয়ে ওঠেন যে, তৎকালীন পৃথিবীর শাসক জাতি পারস্যকে তারা পরাজিত করেন। হীরার মতো একের পর এক প্রদেশ জয় করে শেষ পর্যন্ত গোটা পারস্য সাম্রাজ্যকে খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসেন তারা।

এখানে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, পারস্যের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল যে মুসলিম বাহিনী তাতে অধিকাংশ যোদ্ধাই ছিলেন শুবিল (রা.) এর মতো নিরক্ষর। সেই নিরক্ষর জাতিকে দিয়ে আল্লাহ পরাজিত করেছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধষ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে। ইসলামের সঠিক আদর্শ ও সেই আদর্শকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার আকুলতাই তাদেরকে করে তুলেছিল দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা জাতি।

আমাদের জন্য আফসোসের বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সেই সোনালী যুগের ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। অথচ ব্রিটিশ রাজা-রাণীদের নাম, খ্যাতি, জৌলুশ সবই আমাদের মুখস্ত। আসুন নিজেদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হই। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা ছিলাম বিজয়ী জাতি। ইসলামের সোনালী যুগের সেই বিজয়ের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আমরা তুলে ধরছি।

সাহিত্য

বিশ্বজয়ের কর্মসূচি

রিয়াদুল হাসান

ঐক্য শৃংখলা আনুগত্য
হিজরত আর জেহাদ।
এই হলো পাঁচ দফা কর্মসূচি,
আল্লাহর কুদরাত।
রসুলের সংগ্রামী সারাটা জীবন
পাঁচ দফা ছাড়া কিছু নয়।
গড়ে তুলেছেন জাতি বিশ্বজয়ী,
করতে রবের খেলাফাত।
ঐক্য শৃংখলা আনুগত্য
হিজরত আর জেহাদ।

রসুলাল্লাহর যত হাদিসের ভিড়ে
চাপা ছিল এই সত্য,
আল্লাহ এ যামানার এমামের কাছে
জানালেন এর-অর্থ।
জানালেন মোজেজার মধ্য দিয়ে
বিশ্বজয়ের সংবাদ ।
ঐক্য শংখলা আনুগত্য
হিজরত আর জেহাদ।

এই পাঁচদফা থেকে বিচ্যুত হলে
থাকবে না দীনে কেউ আর,
ভিন্নপথের দিকে ডাকলে জাহান্নামে
হবেই সে জ্বালানি পাথর।
যতই সে হোক নামাজি ও রোজাদার
সমস্ত তার বরবাদ,
ঐক্য শংখলা আনুগত্য
হিজরত আর জেহাদ।

[১৯৯৫ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে দীন প্রতিষ্ঠার পাঁচ দফা কর্মসূচিটি হেযবুত তওহীদের জন্য গ্রহণ করেন এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।]

বীর মোজাহেদ চাই

রাকীব আল হাসান

জ্বলছে বাড়ি, পুড়ছে গাড়ি
হাসপাতালও শেষ।
অনাহারি, শিশু-নারী
হচ্ছে নিরুদ্দেশ।

যাচ্ছে মারা, গৃহহারা
মানুষ লাখে লাখ।
পারছিনা হায়, বলতে তোমায়
আজ এটুকুই থাক।

এই কাহিনী, কে শুনেনি?
এইতো ফিলিস্তিন।
আমরা জানি, মুসলমান-ই
কাঁদছে রাত্রি-দিন।

খালিদ দেরার, চাই বারেবার
রুখতে তাদের ভাই
রাখবে আজই, জীবন বাজি
বীর মোজাহেদ চাই।।

ইরাক-আফগান, লিবিয়া-সুদান
নেই তো কলরব।
লেবানন আর, সিরিয়া আমার
ধ্বংস করিল সব।

মুসলিম তুমি, আর কত ভূমি
হারালে হইবে হুঁশ?
আর কত মার, খাইলে তোমার
কাটিবে দশা বেহুঁশ?

খালিদ দেরার, চাই বারেবার
রুখতে তাদের ভাই
রাখবে আজই, জীবন বাজি
বীর মোজাহেদ চাই।।
শোনো শোনো সব, বলেছেন রব
ঐক্যবদ্ধ হতে।
রেখে হাত হাতে, এক কালিমাতে
এসো এক পথ-মতে।

কর তাড়াতাড়ি, ধরো তরবারি
করি দ্বীন-পথে রণ
জানমাল জানি, দিলে কোরবানি
বাঁচিবে প্রতিটা জন।

ডাকিছে পাখি, খোলো গো আঁখি
হাকিছে মুয়াজ্জিন।
পড়িবে নামাজ, গড়িবে সমাজ
মানিবে খোদার দ্বীন।

রাখিবে রোজা, এসব সোজা
কিন্তু জানো না ভাই?
অস্ত্র ধরা, যুদ্ধ করা
এতও সহজ নয়।

দাড়ি-টুপি, আলেমরূপী
সুরত ধরা যায়।
রাখবে আজই, জীবন বাজি
বীর মোজাহেদ চাই।

আমিত্ব রচনা করুক ইতিহাস

নিশাত সালসাবিল

আমার আমিত্ব আমাকে জগতে মহান করবে,
আমার আমিত্বই আমাকে বিলীন করবে।
তাই তো বিদ্রোহী কবির কবিতার 'আমি'ই
সেই বিদ্রোহী
আমি চির-দুর্দম, দুর্বিনীত,
আমি বন্ধনহীন মানব-ত্রাণকারী বন্ধু,
আমিই ঝঞ্ঝা, আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস!
আমার আমিত্ব হোক ন্যায়ের ঝাণ্ডাধারী,
ন্যায়ের সমীপে অবনত হোক আমার শির,
আমার আমিত্ব না হোক অহমিকার প্রকাশ
আমার আমিত্বের রচনায় হোক
সকল অশুভের বিনাশ!
অন্যায়গুলো হোক আমার চরণে ধুলিসাৎ,
আমার আমিত্বে হোক জগতে শুদ্ধিস্নান!

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাননীয় এমাম সম্পর্কে শুভাকাঙ্খীদের মন্তব্য

@rubelislam6553 3 weeks ago
বাস্তব সম্মত কথা।
ইনার মতো মানুষ বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসা দরকার।

R @RobiulIslam-lt7qt 4 days ago 2 subscribers
কলিজার জমে থাকা কথাগুলো একমাত্র আপনিই বলেন। আপনি বাংলার এক সাহসি বীর।

P @ProdibMondal-s8w 13 days ago 1 subscribers
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনার বক্তব্য শুনতে খুবই ভালো লাগে আমার মনে হয় আপনার দলে আমি যোগদান করি আসলে আপনি ভাল আপনি সত্য কথা বলেন তাই আপনি ইসলামের কাছে খারাপ আপনাকে হাজার হাজার সালাম গ্রহণ করুন আপনি

M @mstrinabegum2490 8 days ago 2 subscribers
আপনার কথা আমার বরাবরই ভালো লাগে আপনার হাতে কিছুদিন ক্ষমতা দিয়ে দেখা দরকার।

@IkhtilafMedia 12 days ago
আপনার ভিডিওগুলো আমি দেখি না কিন্তু এই ভিডিও দেখার পর যেটা মনে হলো আপনি সঠিক কথা বলেছেন এজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ

N @NiranjanGhosh-i3f 3 days ago
Wanderful speech...!!! Very logical thought about situation...salute to you dear.. my brother.
Kolkata..NG.

S @SubhasSarkar-e4d 13 days ago 1 subscribers
সেলিমজী, সুযোগ পেলেই আমি আপনার বক্তব্য আদ্যোপান্ত শুনি। খুবই সুন্দর সহজভাবে যৌক্তিক বক্তব্য অসাধারণ লাগে। এগিয়ে যাবেন।

@apurboroy2667 12 days ago 2 subscribers
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏 ইস যদি একটিবার আপনার সাথে দেখা করতে পারতাম। নিজেকে ধন্য মনে করতাম

B @BillalBillal-x6z 3 weeks ago
আজ থেকে আপনাকে সার্পোর্ট করবো আমরা বি এনপি র পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ

N @nafeenafi1516 2 weeks ago
সেলিম,ভাই,এতোদীন,আপনাকে,সোজজো,কোরতে,পারতামনা,কিনতু,এখুন,বুঝলাম,আপনার,কথাই,ঠিক

N @NikhilBaral-lc3ko 3 weeks ago
ভগবানের কাছে কৃপা রাখি আপনি ভালো থাকুন আপনার মত মানুষ পৃথিবীতে দরকার নইলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আপনি অনেক জ্ঞানী

B @bidhanbiswas2993 3 weeks ago
Ami Ekjon Bharatio Hindu, amar nam Bidhan. Aapnar pray sob videos aami dekhi ebong sob boktobya suni. Prokrito Islamki anong sob islam ponthider seta kibhabe follow kora darkar seta aapni jevabe bojhan, seta sotiyee khub prosansar. Apnake Selu dada. Aapni aaro baro maper ekjob dharmopran muslim hon etai aamar prarthona upar-aalaar nikot. Bhalo thakun Swustha Thakun.

এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ

নাম:
নৌশিন শারমিলি মিনহা
পিতার নাম:
শহিদুল আলম
মাতার নাম:
ফাহিমা আক্তার
শাখা: হবিগঞ্জ সদর
জিপিএ: ৫.০০

নাম:
হুমায়রা বিনতে সাইফ
পিতার নাম:
মো. সাইফুর রহমান
মাতার নাম:
নাজমিন নাহার
শাখা: সোনাইমুড়ি
জিপিএ: ৪.৮৯

নাম:
সুমাইয়া ইসলাম
পিতার নাম:
শফিকুল ইসলাম
মাতার নাম:
সাকিনা আক্তার
শাখা: সাভার ক্যান্টনমেন্ট
জিপিএ: ৪.৭২

নাম:
হামনা বিনতে কামাল
পিতার নাম:
কামাল মীর
মাতার নাম:
নিপা কামাল
শাখা: যাত্রাবাড়ি
জিপিএ: ৪.৬১

নাম:
সানজিদ হাওলাদার
পিতার নাম:
আব্দুল আলীম হাওলাদার
মাতার নাম:
রুমী আক্তার
শাখা: মতিঝিল
জিপিএ: ৪.৫০

নাম:
তুরাইফা মীর
পিতার নাম:
সোহাগ মীর
মাতার নাম:
মনি বেগম
শাখা: নারায়ণগঞ্জ
জিপিএ: ৪.৪৪

নাম:
নায়েমা সুলতানা আতেফা
পিতার নাম:
হেমায়েত হোসেন
মাতার নাম:
নাহার জুঁথি
শাখা: তেজগাঁও
জিপিএ: ৪.১১

নাম:
রুম্মান বিন রশিদ
পিতার নাম:
মো. আব্দুর রশিদ
মাতার নাম:
মোসাম্মাৎ মনসুরা বেগম
শাখা: নরসিংদী
জিপিএ: ৩.৩৯

“ আখবারে তওহীদের পক্ষ থেকে সকল কৃতী শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

শুভ বিবাহ

বর:
মো. ফারুক মিয়া
কনে:
তাসনুভা নুহা তানজিন
বিবাহের তারিখ:
১২ জুন ২০২৫
শাখা: নরসিংদী

বর: শাকিল মিয়া, কনে: লিজা আক্তার
বিবাহের তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৫, শাখা: উত্তরা, ঢাকা।

আখবারে তওহীদের পক্ষ থেকে নবদম্পতিকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শুভ জন্মদিন

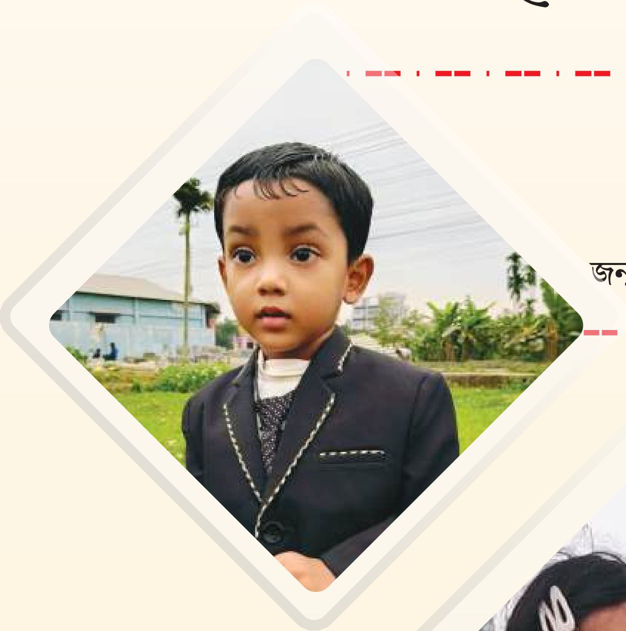

নাম: ইউসুফ বিন
পিতা : আক্কাস আলী রিপন
মাতা : নাজমা আক্তার
জন্ম তারিখ : ১২ জুলাই ২০২১

নাম: উজায়ের বিন আনোয়ার
পিতা : মো. আনোয়ার হোসেন
মাতা : রোজিনা আক্তার
জন্ম তারিখ : ২২ জুলাই ২০২২

“ আখবারে তওহীদের পক্ষ থেকে তাদের জন্মদিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায় সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

সম্পাদক: রিয়াদুল হাসান

নির্বাহী সম্পাদক: আদিবা ইসলাম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: জোবায়ের হাসান

ইমেইল: akhbaretawheed1995@gmail.com

সেপ্টেম্বর ২০২৫

আখবারে তওহীদ

৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২০ (বিশ) টাকা মাত্র